ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব
নরেন বিশ্বাস

ভাষা-শহীদ

গ্রন্থমালা

অমর একুশে বাংলা একাডেমীর নিবেদন : ১৯৮৬

ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব

নরেন বিশ্বাস

বাংলা একাডেমী ঢাকা

ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ : ৫ পৌষ ১৩৯২ ॥ ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫

বা/এ ॥ ১৭৫১

পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক : শামসুজ্জামান খান পরিচালক গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রক : ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

মূল্য : পনেরো টাকা মাত্র ॥ বিদেশে : দেড় মার্কিন ডলার

BHASHA-SHAHEED GRANTHAMALA : Series in honour of the martyrs of the Language Movement of February 1952.

BHAROTIO KAVYATATTHA [Indian Thoughts on Poetry] by Naren Biswas. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh : 5 Poush 1392 / 21 December 1985. Price : Taka 15·00 only ;
Outside Bangladesh US Dollar 1·50

Tribute in February 1986 to the Martyrs of February 1952

উৎসর্গ

আমার কাব্যতত্ত্বের শিক্ষক
মুনীর চৌধুরী
শ্রদ্ধাভাজনেষু

প্রসঙ্গ-কথা

বাহান্নোর ভাষা-শহীদেরা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর দেখতে চেয়েছিলেন, সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অবাধ বিচরণ আজো স্বপ্ন। এ স্বপ্নকে খানিক-টুকু হলেও সত্য ক'রে তোলার এক বিনীত চেষ্টা থেকে এ গ্রন্থমালা।

বাংলা একাডেমী সকলের একাডেমী। সবারই দাবি এর উপর। এ গ্রন্থমালার বই তাই সবার জন্যে। কেবল বিশেষজ্ঞের জন্যে নয়, কেবল শিক্ষার্থীর জন্যে নয়। নানা বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থমালা — জ্ঞানের সব দিগন্তই যেন একদিন ছুঁতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকেই এই প্রথম বারের মতো লিখলেন কিংবা এই প্রথম বারের মতো বাংলায় লিখলেন। আমাদের চিন্তার ভুবনে নতুন কণ্ঠ বড়ো প্রয়োজন।

কবিতা কি এ নিয়ে নানা দেশে যুগ-যুগ ধরে আলোচনা হয়েছে, কবিতা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ উপমহা-দেশে কবিতার যে-তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, তা য়ুরোপীয় চিন্তা থেকে ভিন্ন। এ তত্ত্বই এ বইয়ে বিবেচনা করা হয়েছে।

এ গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ভাষা-শহীদদের বারবার শ্রদ্ধা জানাই।

মনজুরে মওলা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিবৃত্ত বর্ণনার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন কাব্য বলতে তাঁরা কি বুঝতেন এবং তাঁদের বিচারে কাব্যের সংজ্ঞার্থই বা কি ?

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে 'কাব্য' ও 'সাহিত্য' প্রায়শ একার্থবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। সংস্কৃতভাষার প্রথমদিকে একমাত্র 'কাব্য' শব্দেরই ব্যাপক প্রচলন ছিলো। এবং সাহিত্য শিল্পের নানা প্রজাতি ছিলো এ কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এজন্যে তাঁরা কবিতা-মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, চম্পূকাব্য, আখ্যানকাব্য এমনকি গদ্যে বর্ণিত অন্যান্য রচনাকেও ব্যাপকভাবে বলতেন 'শ্রব্যকাব্য' এবং নাটককে আখ্যায়িত করতেন দৃশ্যকাব্যরূপে। ফলে তাঁদের রচিত কাব্যাদর্শ, কাব্যালঙ্কার, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যানুশাসন, কাব্য-মীমাংসা বা সাহিত্যদর্পণ—একই শ্রেণীর গ্রন্থ। সম্ভবত 'কাব্য' অর্থে 'সাহিত্য' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় মধ্যযুগের কোনো এক সময় থেকে। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দে রাজশেখর তাঁর বিখ্যাত 'কাব্য-মীমাংসা' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে 'কাব্য' অর্থে 'সাহিত্য' শব্দটির প্রয়োগ করেন। তিনি কাব্য-মীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ে কল্পিত বর্ণনায় তুলে ধরেছিলেন এক কাব্যপুরুষ ও সাহিত্যবিদ্যাবধূকে, যেখানে কাব্যপুরুষ সাহিত্য-বিদ্যাবধূর ধর্মপতি।

আমরা সাম্প্রতিককালে কাব্য ও সাহিত্য শব্দ দু'টোকে সমার্থক বিবেচনা করে থাকি। ফলে, এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে অনর্থক বিতর্কে না গিয়ে আমরা এবারে এর স্বরূপ সন্ধানে ব্রতী হতে চাই। কাব্য-সাহিত্য জীবন-সম্পৃক্ত। কালে জীবন বিবর্তিত হয়, পরিবর্তন ঘটে দীর্ঘকালের লালিত মূল্যবোধের, বিশ্বাসের বেলাভূমি বিচূর্ণ হয় বোমার আঘাতে, ফলে জীবনের মতো কাব্য সাহিত্যেরও পালাবদল সূচিত হয় অনিবার্যভাবে, অবধারিত সূত্রে। নিরন্তর রূপান্তরিত জীবনে চেতনার পট পরিবর্তনে শিল্পী-হৃদয়ের ও আনুভূতিক প্রেক্ষাপট বদলে যায়, তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে শিল্পসাহিত্যের নানা প্রজাতিতে, রূপে-স্বরূপে, আকৃতি এবং প্রকৃতিতে। আত্ম-রূপ দর্শন-প্রবণতা মানুষের সহজাত। আর্শিতে প্রতিফলিত আপন রূপ দেখে মানুষ তৃপ্ত হতে পারে নি, অবিকল রূপ তার রূপ-তৃষ্ণা মেটাতে পারে নি, তাই কারু-শিল্পে, দারুশিল্পে, চারুশিল্পে, ভাস্কর্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে, নাট্যে, কাব্যে অর্থাৎ তাবৎ শিল্পকর্মে বা সাহিত্যে সে তার আন্তর-সত্তার সন্দর্শন প্রার্থনা করেছে, স্ব-রূপের অন্বেষায় ব্যাপৃত রয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে। আত্মপ্রকাশের এক অপ্রতিরোধ্য বোধ তাকে তাড়িত করেছে যুগে যুগান্তরে। রবীন্দ্র-ভাষ্যে —

ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

যে কোনো শিল্পী তাঁর বাসনা বা অনুভবকে প্রকাশ করেন, বাইরের জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে সাঙ্গীকৃত করে। ফলে তাঁর সৃষ্টিতে আত্ম-চেতনার প্রতিফলনের সঙ্গে প্রতিফলিত হয় স্বকালের, স্বদেশের, স্ব-সমাজের চারিত্র্য-লক্ষণ। দেশ-কাল, সমাজ-সভ্যতার পার্থক্যে, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে সারা বিশ্বের শিল্পকর্ম তাই এতো ব্যাপক এবং বিচিত্র। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-দর্শন সমাজসভ্যতার

মর্মশায়ী চেতনার প্রতিফলনও তাই এ ভূখণ্ডের শিল্পকর্মে স্বতন্ত্র-মাত্রা সংযোজিত করেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের মতো ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য-স্বজনের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। কিন্তু কাব্য–নির্মাণের ইতিহাস যতোটা পুরানো, কাব্যতত্ত্বের ইতিহাস কিন্তু অতোটা পুরানো নয়। কারণ, আগে কাব্য তারপর আসে তার তত্ত্ব।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম মোহিতম্ ॥

রামায়ণ, বালকাণ্ড, ১/১৫

অর্থাৎ, ওরে ব্যাধ, তুই (যেহেতু) কামমোহিত ক্রৌঞ্চযুগলের পুরুষটিকে হত্যা করেছিস, (সেজন্য) কোনোদিনই তুই (জীবনে) সুখী হতে পারবি না (প্রতিষ্ঠা পাবি না)।

আদিকবি বাল্মীকি তমসাতীরে ভ্রমণরত অবস্থায় ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে যখন প্রথম করুণ রসের এ শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন, তখন তিনি নিজেও জানতেন না কী তিনি নির্মাণ করেছেন। কিন্তু রচনার পর তাঁর হৃদয়ে সঞ্চারিত হলো এক বিস্ময়বোধ, জিজ্ঞাসা জাগলো–"কিমিদং ব্যবহৃতং ময়া।" বাল্মীকি-হৃদয়ের এ অনির্বাণ জিজ্ঞাসার হাত থেকে অব্যাহতি পেলো না উত্তরকালের পাঠক শিল্পী এবং কাব্যরসিক সমাজ।

সে-যুগের বাল্মীকির মতো এ-যুগের রবীন্দ্র-কবিচিত্তেও ভিন্ন ভাষায় একই বিস্ময়ের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ ঘটেছে 'চিত্রা' কাব্যের 'অন্তর্যামী' কবিতায়:

সে মায়ামুরতি কী কহিছে বাণী
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগণ।

এ যে সঙ্গীত কোথা হতে উঠে
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর-বিদারণ।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।

যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

বিন্দুতে যেমন সিন্ধুর ধর্ম বর্তমান, তেমনি বাল্মীকি-হৃদয়ে জাগ্রত এ জিজ্ঞাসায় [কিমিদং—এ কী (বস্তু)! এর স্বরূপ কী ?] জন্ম নিলো হাজারো প্রশ্ন। আর এরই উত্তর অনুসন্ধানে রচিত হলো কাব্যের শরীর ও মনের আকৃতি ও প্রকৃতির, রূপ ও স্বরূপের তত্ত্ব-সন্ধানী অলঙ্কার-শাস্ত্রের, কাব্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসা বিষয়ক বিচিত্র গ্রন্থরাজি।

কাব্যের সংজ্ঞার্থ কি, কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়, কাব্যের আত্মাই-বা কি ? এ-ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন প্রবলভাবে তাড়িত করেছে প্রাচীন ভারতের প্রাজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজকে। তাঁদের উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নে আছে নানা বিতর্ক-বিচার, আছে গভীর সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্ব আলোচনা। আমরা সে-সমস্ত জটিল তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে না গিয়ে এ অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত এবং সরলভাবে কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে প্রধান কয়েকজনের বক্তব্যের সারাৎসার সঙ্কলনে প্রয়াস পাবো মাত্র।

আচার্য ভরতকে ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাঁর আবির্ভাব কাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিতর্ক বর্তমান। কারো মতে তিনি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দের, আবার কেউ কেউ বলেন তিনি খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দের লোক ছিলেন। (খ্রীস্টপূর্ব কয়েকটি শতাব্দ থেকে খ্রীস্টের জন্মের পরবর্তী অনেকগুলো অব্দ পর্যন্ত যে কোনো সময় তাঁর জন্ম হতে পারে)। সে-যাহোক প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার এ মনীষী ভারতীয় নাট্য বেদের অদিগুরু এবং অলঙ্কারশাস্ত্র বা কাব্যতত্ত্বের পথিকৃৎ হিসেবে কীর্তিত। তিনি তার স্থবিশাল 'নাট্যশাস্ত্রের' (যাকে পঞ্চম বা গান্ধর্ববেদও বলা হয়) মূলত দৃশ্যকাব্য বা নাট্য-শাস্ত্রেরই (উল্লেখ্য ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে নাট্যরস ও ভাবসমূহ বিচার) আলোচনা করেছেন। তবে শ্রব্যকাব্য প্রসঙ্গও তাঁর গ্রন্থে একান্তভাবে উপেক্ষিত থাকে নি। (স্মর্তব্য: ষোড়শ অধ্যায়ে কাব্যের অলঙ্কার দোষ-গুণ ও লক্ষণসমূহের মনোজ্ঞ আলোচনা।) তিনি অবশ্য তাবৎ কাব্যের শ্রেষ্ঠ-তত্ত্বরূপে 'রস'কেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং রসতত্ত্বের প্রবর্তকরূপে তিনি প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে বিপুলভাবে বন্দিত। তাঁর মতে 'রসই' হচ্ছে সাহিত্য-বৃক্ষের বীজ :

> যথা বীজাদ্ ভবেদ্‌বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
> তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ।।
>
> — নাট্যশাস্ত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

অর্থাৎ বীজ হতে যেমন গাছ হয়, এবং গাছ হতে ফুল ও ফল, তেমনি রসবীজ হতেই কাব্য এবং এ কাব্যের ফুল-ফল (ভাব, রীতি অলঙ্কার ইত্যাদি)।

আচার্য ভরত কাব্যের সারীভূত তত্ত্বরূপে 'রসকেই' চিহ্নিত করলেও অলঙ্কার, রীতি, গুণ ইত্যাদি কাব্যের সৌন্দর্যবিধায়ক বিষয় সম্পর্কে

কোনো প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নি। কিন্তু রসের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে এ সমস্ত প্রসঙ্গ অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে। আত্মানুসন্ধিৎসা যেহেতু ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মৌল-বৈশিষ্ট্য, সেজন্যেই হয়তো কাব্যের মূল অন্বেষায় তাঁরা কাব্যের শরীরে সজ্জিত কাব্যের আত্মাকেই অত্যধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন।

কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারের চেয়ে অন্তরঙ্গ বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ তাই এ দেশের কাব্যতত্ত্বে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে সুপ্রাচীনকাল থেকে। ফলে তাঁরা কাব্যের আত্মা অনুসন্ধানে যতোটা সময়-শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন, কাব্য-শরীর ততোটা যত্ন ও উৎসাহ দেখান নি অনেকেই। কিন্তু একথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, রস বা আত্মা যেহেতু কাব্য-দেহ নিরপেক্ষ কোনো বিষয় নয়, শব্দ-বাক্যকে আশ্রয় বা অবলম্বন করেই তাকে বিকশিত হতে হয়। ফলে শব্দার্থময় পদ কিংবা বাক্যাবলীকে নির্বাসিত করলে তো কাব্যের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং ভরতপরবর্তী অনেক কাব্যতাত্ত্বিক এ বিষয়ে স্বতন্ত্র বক্তব্য হাজির করলেন কাব্যের কায়াত্ব নিরূপণে।

ষষ্ঠ শতাব্দে (কারো মতে অষ্টম শতাব্দে) আচার্য দণ্ডী (কিংবদন্তীতে প্রচলিত রাজা বিক্রম আদিত্যের সভা-পণ্ডিতরূপে খ্যাত) প্রাঞ্জল ভাষা-শৈলীতে নিজের রচিত মনোহর উদাহরণ সহযোগে 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অলঙ্কার-প্রস্থানের সমর্থক আচার্য দণ্ডী এ গ্রন্থে অলঙ্কারকে কাব্যের সৌন্দর্যবিধায়ক ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করলেন অকুণ্ঠচিত্তে: কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে।

এবং কাব্যের সংজ্ঞার্থ নির্দেশে তাঁর উচ্চারণ:

. . . . . সুবহু।

বাচাং বিচিত্রমার্গাণাং নিববন্ধুঃ ক্রিয়াবিধিম্ ॥

তৈঃ শরীরং চ বাক্যানাম্ অলঙ্কারাশ্চ দর্শিতাঃ।
শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী ।।
—কাব্যাদর্শ, ১/৯-১০

অর্থাৎ পূর্বসূরিগণ বিচিত্ররূপা বাণীর বন্দনকলা (কৌশল) বিধিবদ্ধ করে গেছেন, তাঁরা দেখিয়েছেন কাব্যশরীরের স্বরূপ (অলঙ্কার), তাঁদের অনুসরণে বলা যায় যে অভীষ্ট অর্থ সংবলিত পদাবলীই কাব্য। ফলে 'কাব্যাদর্শে' বর্ণিত বিষয়ের আলোকে আমরা আচার্য দণ্ডীকে অলঙ্কার প্রস্থানের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এবং কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে তাঁর কালাতিক্রমী উক্তি আজও আমাদের বিপুল বিস্ময় সৃষ্টিতে সক্ষম।

"ইদম্ অন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।। কাব্যাদর্শ, ১/৪

অর্থাৎ শব্দনামক জ্যোতি সকল সংসার আলোকিত না করলে ত্রিভুবন অন্ধকারে ডুবে যেতো। অবশ্য তাঁর অনেক মত ও মন্তব্য পরবর্তীকালের কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণে অম্লান প্রভাব বিস্তারে সমর্থ না হলেও 'কাব্যাদর্শ' ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল সংযোজন।

সপ্তম শতাব্দের খ্যাতিমান কাব্যতাত্ত্বিক ভামহ। তাঁর রচিত 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে তিনি শব্দ ও অর্থের সার্থক সন্নিপাত বা মিলনকেই কাব্য বলে বিবেচনা করেছেন। (শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্। কাব্যালঙ্কার ১/১৬) এবং তিনি শব্দার্থময় বাক্যকে কাব্য হিসেবে চূড়ান্ত রায় প্রদান করে, কাব্যনির্মাণে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন কাব্যের অলঙ্কার প্রসঙ্গে। তাঁর মতে অলঙ্কারের সার্থক-সুন্দর প্রয়োগেই কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভরশীল। এবং অলঙ্কারের অসীম মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, আভরণহীনা প্রেয়সীর মুখখানি ও মনোহর বা শোভাকর

হয় না। ("ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বণিতামুখম্ ।।") ফলে এ ধরনের মতামতের কারণে ভামহকে স্থান দেয়া হয় অলঙ্কারবাদী কাব্যতাত্ত্বিকদের প্রথম সারিতে। এখানে উল্লেখ্য, দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' থেকে ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' বেশ জটিল ও ব্যাপক। কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে 'কাব্যাদর্শ' যেখানে প্রাথমিক প্রচেষ্টার প্রাঞ্জল স্বাক্ষর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, সেখানে 'কাব্যালঙ্কার' সে-স্তর অতিক্রমী প্রস্তুতি প্রেরণায় হয়তো বা বেশ কিছুটা দুরূহতার দায়ে চিহ্নিত।

আচার্য ভামহের প্রায় একশ' বছর পরে কাশ্মীর রাজ জয়াপীড়ের অন্যতম মন্ত্রী আচার্য বামন সর্বপ্রথম সূত্রাকারে বিন্যস্ত করে কাব্যতত্ত্ব রচনা করেন এবং নিজেই এর বৃত্তি (ব্যাখ্যা) দিয়ে অর্থ পরিস্ফুট করেন। এ জন্যে তাঁর গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি'। শব্দ ও অর্থ—কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ হলেও একমাত্র বিষয় নয়, এর-চেয়ে গভীরতর বিষয় হচ্ছে কাব্যের কাব্যত্ব বা আত্মা। আচার্য বামন সে গভীরতর জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর 'কাব্যা-লঙ্কার সূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে। তিনি মনোজ্ঞ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে,- "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ" (১/১/১) কাব্য অলঙ্কার হেতু গ্রাহ্য হয় বটে, কিন্তু এ-অলঙ্কার আসলে উপমা রূপকাদি অলঙ্কার নয় (অর্থাৎ বহিরঙ্গের নয়), এ-অলঙ্কার হচ্ছে, "সৌন্দর্য্যম্ অলঙ্কার:" (১/১/২)—"সৌন্দর্যই অলঙ্কার। এবং এ সৌন্দর্য সৃষ্টি করার জন্যে সার্থক কবিকে কাব্যনির্মাণ লগ্নে চলতে হয়, দোষ-পরিহার, গুণ-গ্রহণ এবং অলঙ্কার (অনুপ্রাস-উপমাদি) গ্রহণ এ ত্রয়ীর পথ ধরে। ("স খলু অলঙ্কার: দোষহানাৎ গুণালঙ্কারদানাং চ সম্পাদ্য: কবে:"— ১/১/৩ বামনকৃত বৃত্তি।)

এ তিনের পথ ধরে কাব্য-নির্মাণের বিধান ঘোষণা করলেও আচার্য বামন অলঙ্কারকে কাব্যে অনিত্যধর্ম হিসেবেই আখ্যায়িত করেছেন

এবং নিত্যধর্মরূপে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন 'গুণ' কে ("বিশেষো গুণাত্মা —১/২/৮") যেখানে তিনি বলেছেন "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" (১/২/৬) —রীতিই কাব্যের আত্মা—সেখানেও তিনি রীতি বলতে বুঝিয়েছেন "বিশিষ্টাপদরচনা রীতিঃ। (১/২/৭) যার মূল বৈশিষ্ট্য মাধুর্যাদিগুণে। সংক্ষেপে বলা যায় তাঁর মতে কাব্যের আত্মা রীতি, রীতির আত্মা গুণ এবং এ নিত্য-গুণই প্রকৃতপক্ষে কাব্যের আত্মা। এবং গুণেই কাব্যের শোভা বা সৌন্দর্য, আর এ কাব্য-সৌন্দর্য বিকশিত হয় পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গীকে আশ্রয় করে, মনোহারিত্ব লাভ করে অনুপ্রাস-শ্লেষ উপমা-রূপকাদি বহিরঙ্গের অনিত্য অলঙ্কারের সার্থক সংযোগে। তিনি তাঁর এ তত্ত্বকে একটি অবিস্মরণীয় কবিতার আশ্রয়ে অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী করে তুলেছেন। যে-অনুপম কবিতাটির সারাৎসার হচ্ছে: যুবতী রমণীর রূপলাবণ্যই মুগ্ধ করে রসিকচিত্তকে, নির্বাচিত অলঙ্কারে সে-রূপ আরো রমণীয় হয় বটে. কিন্তু কালে যখন লাবণ্য নির্বাসিত হয় তখন তার দেহে লোচনরোচন হাজারো অলঙ্কার চাপালেও সে-লাবণ্য ফিরে আসে না সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না, কেউ ফিরেও তাকায় না তার দিকে। বলা বাহুল্য, এখানে তিনি লাবণ্য বলতে বুঝিয়েছেন কাব্যের গুণকে (প্রসাদমাধুর্যাদি), আর অলঙ্কার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অনুপ্রাস-উপমাদি নানাবিধ কাব্যালঙ্কারকে। (শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা গ্রন্থে "কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারৎ" এবং "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" সূত্র দুটির ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আচার্য বামন সম্পর্কে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন, প্রাগুক্ত আলোচনায় বোধ করি তার নিরসন হতে পারে।) আসলে, "রীতিরাত্মা কাব্যস্য"—রীতিই কাব্যের আত্মা, এটি ভামহের কাব্য-সংজ্ঞার্থের বিপরীত তত্ত্ব এবং ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় বামনের নোতুন সংযোজন।

আচার্য বামনের পরে উল্লেখযোগ্য কাব্যতাত্ত্বিক আচার্য উদ্ভট। তিনি ছিলেন কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের (৭৭৯-৮১৩ খ্রীস্টাব্দ) রাজসভার সভাপতি। বিখ্যাত 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে তাঁর বেতন ছিলো নাকি দৈনিক এক লক্ষ দীনার (স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ):

"বিদ্বান্ দীনারলক্ষেণ প্রত্যহংকৃত বেতনঃ।
ভট্টোহভূৎ উদ্ভটস্তস্য ভূমিভর্তুঃ সভাপতিঃ॥" ৪। ৪৯৫

অর্থাৎ দৈনিক যার এক লক্ষ দীনার বেতন ছিলো, সেই ভট্ট-উদ্ভট রাজসভার (রাজা জয়াপীড়ের) সভাপতি ছিলেন।

আচার্য ভামহ-কৃত 'কাব্যালঙ্কার'-এর প্রথম ব্যাখ্যাকার এ ভট্ট-উদ্ভট। এজন্যে তাঁর এ গ্রন্থের নাম হয়েছে "ভামহ বিবরণ।" ভট্ট-উদ্ভট কেবল কাব্যতাত্ত্বিক ছিলেন না, 'কুমারসম্ভব' কাব্যের কবি-রূপেও তাঁর উল্লেখ আছে পরবর্তীকালের কতিপয় গ্রন্থে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ প্রাজ্ঞ মনীষীর দু'খানি গ্রন্থই অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। তবে জার্মান পণ্ডিত Dr. G. Buhlar আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত উদ্ভটের 'কাব্যালঙ্কার সার সংগ্রহ'তে ভামহের কাব্যালঙ্কারের অংশ বিশেষ এবং তাঁর নিজের কিছু তত্ত্ব ও 'কুমার সম্ভব' কাব্য থেকে উৎকলিত বহু দৃষ্টান্তের সন্ধান মেলে।

তবে একথা স্বীকার্য যে, ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে ভট্ট-উদ্ভট এক স্মর্তব্য ব্যক্তিত্ব। কাব্যতত্ত্ব বিচারে রসবাদী হিসেবে কীর্তিত এ পণ্ডিতের বহু মত শ্রদ্ধাসহকারে আলোচনা করেছেন পরবর্তীকালের আনন্দবর্ধন-অভিনব গুপ্তের মতো খ্যাতিমান আলঙ্কারিকেরা।

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে "ধ্বন্যালোক" এক দীপ্র সংযোজন। এ গ্রন্থের অসামান্য প্রভাব হেতু পি. ভি. কানে (kane) মন্তব্য করেছিলেন: The Dhvanyaloka is an epoch making work in the history of Alankara literature. শতাধিক

পদসম্বলিত ছন্দে রচিত এ ধ্বন্যালোক সত্যি ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব সংযোজন। রচয়িতা অজ্ঞাত। কিন্তু অনেকের ভুল ধারণা, আনন্দবর্ধন এর রচয়িতা। আসলে ধ্বন্যালোকের মূল 'কারিকার' রচয়িতার নাম জানা যায় নি, আনন্দবর্ধন এর 'বৃত্তি' (আলোক) রচনা করেন এবং প্রখ্যাত কাব্যতাত্ত্বিক আচার্য অভিনব গুপ্ত এ বৃত্তি বা আলোকের ব্যাখ্যা লিখেছেন 'লোচন' নাম দিয়ে। কারিকার রচয়িতা যেহেতু অজ্ঞাত সেজন্যে আমরা বৃত্তি বা আলোক রচয়িতা আনন্দবর্ধেনের সময়কাল অনুসন্ধানে ব্রতী হতে পারি। 'রাজতরঙ্গিণীর ভাষ্য অনুসারে :

> মুক্তাকন-শিবস্বামী-কবিরানন্দবর্দ্ধন : ।
> প্রথাং রত্নাকরশ্চাগাৎ সাম্রাজ্যেহবন্তিবর্ম্মণ : ।।"

কাশ্মীর অধিপতি এ অবন্তিবর্মার রাজত্বকাল ৮৫৭-৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এ-সময়ের কাব্যতাত্ত্বিক বলে খ্যাত আনন্দবর্ধন এবং পণ্ডিতদের অনুমান হয়তো নবম শতাব্দের শেষদিকেই আনন্দবর্ধন তাঁর বৃত্তি বা 'আলোক' রচনা করেন। এবং 'আলোক' রচনার প্রায় এক'শ বছর পর অভিনব গুপ্ত রচনা করেন ধ্বন্যালোকের টীকা যা 'লোচন' নামে খ্যাত। তাহলে ধ্বনি-কারিকা, আলোক (বৃত্তি) এবং লোচন (টীকা)-এ-তিনের সমন্বয়েই 'ধ্বন্যালোক'।

"কাব্যস্যাত্মাধ্বনিরিতি"— ধ্বনিই কাব্যের আত্মা, এটাই গোটা ধ্বন্যালোকের প্রধান বাণী। কাব্য কি, কাব্যের আত্মা কি ইত্যাদি প্রসঙ্গে ধ্বনিবাদীদের বিতর্ক-বিচার যেমন গভীর তেমনি সূক্ষ্ম ও মর্মসন্ধানী। তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে কাব্যের আত্মা, শব্দ, অর্থ, অলঙ্কার বা রীতি নয়, এর অতিরিক্ত অন্য কিছু, যা তাঁদের পরিভাষায় 'ধ্বনি' হিসেবে আখ্যায়িত। নারীদেহের লাবণ্য যেমন

অলঙ্কারাদি ব্যতিরেকেও দীপ্তিমান তেমনি কাব্যলাবণ্যও (ধ্বনি) অলঙ্কার, রীতি বা গুণ ছাড়াও ভাস্বর।

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব
বস্তুতি বাণীষু মহাকবীনাম্ ।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং
বিভাতি লাবণ্যম্ ইবাঙ্গনাসু ।।"— ধ্বন্যালোক, ১/৪

— মহাকবিদের কবি কর্মে রমণীদেহের লাবণ্যের মতো প্রতীয়মান অর্থ নামে ভিন্ন একটি বস্তু থাকে, যা তাদের প্রসিদ্ধ শরীরের অতিরিক্ত অন্যকিছু। এ অতিরিক্ত বস্তুই কান্তি বা লাবণ্য এবং তাঁদের পরিভাষায় 'ধ্বনি' এবং কাব্যে যেখানে শব্দ ও অর্থ তাদের আপন প্রাধান্য পরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ বাচ্যার্থকে নেপথ্যে রেখে ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে, সেখানেই প্রাজ্ঞজন বর্ণিত 'ধ্বনি'র উদ্ভব হয়ে থাকে।

"যত্রার্থ: শব্দো বা তমর্থম্ উপসর্জনীকৃত-স্বার্থৌ।
ব্যঙ্ক্ত: কাব্যবিশেষ: স ধ্বনিরিতি সূরিভি: কথিত:।।"
— ধ্বন্যালোক, ১/১৩

অর্থাৎ যেখানে কাব্যের অর্থ বা শব্দ নিজেদের অপ্রধান ক'রে প্রতীয়মান অর্থকেই ব্যঞ্জিত করে, সেখানে সেই ব্যঙ্গ্যার্থরূপ কাব্য-বিশেষই প্রাজ্ঞজন কর্তৃক ধ্বনিরূপে আখ্যায়িত হয়।

এ-ব্যঙ্গ্যার্থই ধ্বনি। যদিও বাচ্যার্থকে আশ্রয় ক'রেই এর সূচনা তবু তাকে অতিক্রম করাই এর স্বভাবধর্ম। এবং ব্যঙ্গ্যার্থ যখন বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে পাঠকের চেতনালোকে প্রবল ও প্রধান হয়ে ওঠে তখনই সেটা 'ধ্বনি' নামে ধন্য হয়।

ধ্বনিবাদীরা ও অন্তিমে স্বীকার করেছেন কাব্যের আত্মা হচ্ছে 'রস'। তবে তাঁদের বিবেচনায় ধ্বনিই রস, রসেই ধ্বনির সিদ্ধি, রসেই

ধ্বনির পরম বিশ্রাম। শক্তিমান ও শক্তি, সূর্য ও আলো যেমন অভিন্ন তেমনি রস ও ধ্বনি একাত্ম। রস যদি হয় কাব্যের আত্মা, তবে ধ্বনি সে আত্মার প্রকাশ-রূপ। এজন্যে ধ্বনিবাদীদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা অভিনব গুপ্তের ভাষায় শ্রেষ্ঠ ধ্বনির নাম "রস-ধ্বনি"। এবং এ "রসধ্বনি"কেই কাব্যের আত্মা বলেছেন। ("রসধ্বনে এর সর্বত্র মুখ্যভূতমাত্মত্বম্।")

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে পরবর্তীকালেও এ মতেরই প্রবল প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এবং ধ্বনিবাদী সংসদের এ কাব্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি আধুনিককালের বহু-প্রাজ্ঞজনের ও বিপুল বিস্ময়ের বিষয়। খ্যাতিমান কাব্যতাত্ত্বিক অতুলচন্দ্র গুপ্তের ভাষায়ঃ কাব্য সম্বন্ধে তার চেয়ে খাঁটি কথা কোনো দেশে, কোন কালে, আর কেউ বলেন নি।"— কাব্যজিজ্ঞাসা, (ধ্বনি) পৃষ্ঠা সংখ্যা— ১৫।

কালানুক্রমিকভাবে সাজালে আনন্দবর্ধনের পরেই আসে আচার্য রুদ্রটের নাম। (পণ্ডিতদের অনুমান রুদ্রটের কাল নবম শতাব্দের চতুর্থ দশক থেকে দশম শতাব্দের প্রথম দশক পর্যন্ত।) রুদ্রট রচিত 'কাব্যালঙ্কার' ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আনন্দবর্ধনের 'আলোক' (বৃত্তি)-এর প্রায় দু'দশক পরে তিনি কাব্যালঙ্কার' রচনা করেন, কিন্তু আনন্দবর্ধন বা ধ্বনিবাদ প্রসঙ্গে তাঁর নীরবতা সত্যি বিস্ময়কর।

কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণে রুদ্রটের মৌলিকত্ব তর্কাতীতভাবে স্বীকৃত। যদিও তার ভাষ্যে কাব্য হচ্ছে—"শব্দার্থৌ কাব্যম্" তবু তাঁর বিবেচনায় "রস" মোটেই গৌণ নয়। এবং পণ্ডিতদের অনুমান তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর গ্রন্থে রসের এতো ব্যাপক আলোচনা সন্নিবেশিত করেন তিনি প্রচলিত নবম রসের সঙ্গে "প্রেয়ান্"-নামক দশম রসের প্রবর্তন করেন। (বৈষ্ণব 'সখ্য' রসের অনুরূপ এ রসটি)। আচার্য রুদ্রটের বিচারে "শৃঙ্গার" রসই শ্রেষ্ঠতম। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে এ রস—'কাব্যালঙ্কার'

গ্রন্থের পুরো চারটি অধ্যায়ে (১২শ' থেকে ১৫শ') রসের ব্যাপক-গভীর আলোচনা করেছেন। রস পর্যালোচনায় আচার্য রুদ্রটের নিজস্ব উপলব্ধির সমাচার বিবৃত সুন্দরভাবে। কারণ তিনি জানতেন, নীরস তত্ত্বালোচনাকে সহৃদয় পাঠক এড়িয়ে চলেন, তাই রসময় কাব্য রচনাই বিধেয় এবং এজন্যেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিগণ সর্বদাই সরস কাব্য নির্মাণ করেন, যা কালাতিক্রমী হয়ে নিরবধি রসিক-জনকে আনন্দ দান করে।

"এতে রসা রসবতো রময়ন্তি পুংসঃ
সম্যগ্ বিভজ্য রচিতাশ্চতুরেণ চারু।"

—অর্থাৎ সুনিপুণ স্রষ্টার বিচিত্র স্বাদে পরিবেশিত এ রস সহৃদয় হৃদয় (পুরুষ) 'ক মনোহর আনন্দ দান করে।

রুদ্রটের মতে, শৃঙ্গার দু'রকম: সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভের চারটি শ্রেণী—প্রথম, অনুরাগ বা পূর্বরাগ, তারপর মান এবং অবশেষে প্রবাস ও করুণ। মান আবার তিনভাগে বিভক্ত – সুখসাধ্য, দুঃখসাধ্য ও অসাধ্য। তিনি এমনি করে প্রবাস, অনুরাগ বা পূর্বরাগের ও বিভিন্ন অবস্থার নিপণ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর গ্রন্থে। অভিসারের শ্রেণী বিভাজনেও তিনি কার্পণ্য করেন নি (বর্মাভিসার, তিমিরাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার ইত্যাদি)। রস বিশ্লেষণে আচার্য রুদ্রট ভরতপন্থী অর্থাৎ অধ্বনিবাদীরূপে আখ্যায়িত।

রুদ্রটের পর উল্লেখ্য আলঙ্কারিক কবিরাজ রাজশেখর (৮৮০ – ৯২০ খ্রীস্টাব্দ) কাব্যতত্ত্বে তিনি রসবাদী এবং আচার্য রুদ্রটের মতোই ভরতপন্থী। তাঁর উজ্জ্বল মনীষার দীপ্তিমান ফসল সাহিত্যতত্ত্বের বিচার-গ্রন্থ "কাব্যমীমাংসা"। তাঁর প্রখ্যাত প্রাকৃত নাটক কর্পূরমঞ্জরী" এবং সংস্কৃত নাটক "বিদ্ধশালভঞ্জিকা" "বালরামায়ণ" ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। "কাব্যমীমাংসা

অষ্টাদশ অধিকরণে বিভক্ত। এর মধ্যে কেবল 'কবিরহস্য' (সমগ্র গ্রন্থ-সূচী) আবিষ্কৃত এবং মুদ্রিত। বস্তুত আঠারো অধ্যায়ে 'কবিরহস্য' যদিও গ্রন্থসূচী তবু বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায় এবং বিশ্লেষণের নিপুণতায় এটি যে-কোনো পূর্ণ গ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে।

কাব্যে ধ্বনিবাদ তিনি স্বীকার করেন নি। কাব্যের জন্ম ও বিকাশ প্রসঙ্গের তিনি বায়ুপুরাণ এবং মহাভারত অনুসরণে নিজস্ব কল্পনার মিশ্রণে তাঁর উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এ কল্পিত বর্ণনায়,—'কাব্যপুরুষ' সরস্বতীপুত্র এবং সাহিত্যবিদ্যা' সে কাব্য-পুরুষের দয়িতা। শব্দার্থ তাঁর (কাব্যপুরুষের) শরীর, সমতা প্রসাদাদি —গুণ, সংস্কৃত—মুখ, প্রাকৃত--বাহু, অনুপ্রাস-উপমাদি- অলঙ্কার এবং রস হচ্ছে তাঁর আত্মা।

তাঁর মতে "গুণবৎ অলঙ্কৃতং বাক্যং কাব্যম্"- গুণযুক্ত অলঙ্কৃত বাক্যই কাব্য। তিনি তিন রীতির (বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী) সমর্থক ছিলেন। (রুদ্রটের 'লাটীয়া' রীতিকে স্বীকার করেন নি।)

কবিরাজ রাজশেখর কেবল কাব্যতত্ত্বের বিশদ বিশ্লেষণে তাঁর ধী-শক্তিকে নিঃশেষিত করেন নি, তিনি এ প্রসঙ্গে কবির জীবনযাত্রা, পানীয়, আহার, ভোগ-বিলাস, বাড়ি, বাগান, ষড়্‌ঋতু ভেদে বাসগৃহের বৈচিত্র্য, পুষ্করিণী, দীঘি, 'সারসচক্র বাককলহংস চকোর ক্রৌঞ্চকুরবী" শুকশারী, ময়ূর, হরিণ, চাকর-চাকরাণী, স্নানের ঝরণা, কাব্য-অনু-লেখক, পোশাক, শিক্ষা, ভাষা ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এ যুগের যে কোনো বিলাসী কবিরও স্বপ্নাতীত। কবিরাজ রাজশেখর বোধ হয় সর্বপ্রথম সাহিত্যে চুরিবিদ্যা প্রসঙ্গেও বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে।

বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী এ কাব্যতাত্ত্বিক তাঁর লেখায় নানা ক্ষেত্রে বারংবার উল্লেখ করেছেন অবন্তীসুন্দরীর মতামত। এ বিদুষী

নারী ছিলেন কবিরাজ রাজশেখরের 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়-শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।" ঘরণী মন্ত্রণাদাত্রী সখী এবং ললিত কলাবিদ্যায় (Fine arts) প্রিয় অনুরাগিণী।

৯৩০ থেকে ৯৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের কাব্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে মুকুল, ইন্দুরাজ, ভট্টনায়ক, ধনঞ্জয়, ধনিক, ভট্টতৌতের নামই উল্লেখযোগ্য।

"অভিধাবৃত্তিমাতৃকা" গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে আচার্য মুকুল খ্যাতি-মান। তিনি কাশ্মীরবাসী ছিলেন। এবং আনন্দবর্ধনের (অল্পদিন পরেই তিনি কাব্যতাত্ত্বিক হিসেবে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন) প্রায় সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও ধ্বনিবাদের বিরূপ সমালোচক ছিলেন।

ইন্দুরাজ মুকুলের শিষ্য হিসেবে পরিচিত, কিন্তু খ্যাতিমান কাব্যতাত্ত্বিক অভিনব গুপ্তের সাহিত্য-গুরু হিসেবে স্বীকৃত। তিনি ভট্ট-উদ্ভটের "কাব্যালঙ্কার সার সংগ্রহের ব্যাখ্যা করেন "লঘুবৃত্তি" নামক গ্রন্থে। সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক কোনো মৌলিক গ্রন্থের রচয়িত না হলেও ইন্দুরাজ তাঁর "লঘুবৃত্তি"তে কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে, যা পরবর্তীকালের বহু বিজ্ঞপণ্ডিতকে তাঁর সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলেছে সঙ্গত কারণে। তিনি কোথাও ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা ব'লে স্বীকার করেন নি, কারণ কাব্যতত্ত্বে তিনি ছিলেন পুরোপুরি রসবাদী। তবে তিনি কাব্যের দেহ (Form) নির্মাণ প্রসঙ্গে ছিলেন বামন-মতানুসারী। আচার্য ইন্দুরাজের অলঙ্কার বিষয়ক অভিমত হচ্ছেঃ "অলঙ্কারাণাম্ অনিত্যতা। গুণরহিতং হি কাব্যম্ অকাব্যম্ এব ভবতি, ন তু অলঙ্কার রহিতম্।"—অর্থাৎ অলঙ্কার অনিত্য, গুণহীন কাব্য অকাব্যই হয়ে থাকে, অলঙ্কার থাকলেও। কাব্য সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে তাঁর উচচারণঃ—"গুণসংস্কৃত শব্দার্থকারীরত্বাৎ সরসম্ এব কাব্যম্।"—মার্জিত গুণযুক্ত রসময় বাক্য (শব্দার্থ শরীর) কাব্য।

"হৃদয়দর্পণ" নামক গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য ভট্টনায়ক কাব্যতত্ত্ব -বিচারে ছিলেন ধ্বনিবাদের প্রচণ্ড বিরোধী। কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন রসাত্মবাদী ('কাব্যে রসয়িতা সর্বো')। এবং রসতত্ত্বে তাঁর স্থান ছিলো ভুক্তিবাদী বা ভোগবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয় কারণ কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক "হৃদয়দর্পণ" গ্রন্থটি এখনও অনাবিষ্কৃত। তবে অভিনব গুপ্ত তাঁর "লোচন" টীকায় ভট্টনায়কের বহু মতামত উদ্ধৃত করেছেন শ্রদ্ধাসহকারে। তাঁর কোনো কোনো মতকে অভিনব গুপ্ত সমালোচনা করলেও বহু মতকে স্বীকার করেছেন তর্কাতীত সিদ্ধান্তের মতো।

আচার্য ধনঞ্জয়ের উল্লেখ্য গ্রন্থ "দশরূপক"। "অবলোক" নামে ধনিক এ গ্রন্থের বৃত্তি (ব্যাখ্যা) রচনা করেন। ধনঞ্জয় মালবের রাজা মুঞ্জের সভাসদ ছিলেন। "দশরূপক" ও "অবলোক" দুটো গ্রন্থেরই রচনাকাল দশম শতাব্দের শেষদিকে। ধনঞ্জয় ও ধনিক দুই ভাই ছিলেন ব'লে কথিত। কিন্তু আচার্য শ্যামাপদ চক্রবর্তীর ধারণা: "ধনঞ্জয় আর ধনিক একই ব্যক্তি— ধনঞ্জয় মূল গ্রন্থ রচনা ক'রে ধনিক ছদ্মনামে তার বৃত্তি লেখেন।" "দশরূপক"-মূলতঃ নাট্যশাস্ত্র হলেও এ গ্রন্থে কাব্যের আলোচনা উপেক্ষিত নয়। ধনিক রচিত অপর গ্রন্থ "কাব্যনির্ণয়"। এ গ্রন্থে তিনি ধ্বনিবাদকে সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে" ন রসাদীনাং কাব্যেন সহ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক ভাবঃ। কাব্যং হি ভাবকম্, ভাব্যা রসাদয়।" অর্থাৎ কাব্যের সঙ্গে রসাদির ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক ভাব হয় না। কাব্য ভাবক এবং রসাদি ভাবনীয়।

ধনঞ্জয় এবং ধনিক —এঁরা কেউই সাহিত্যতত্ত্বে কেবল ধ্বনিবাদ নয় ব্যঞ্জনাবাদকেও স্বীকার করেন নি। ধনিকের মতে 'তাৎপর্যই' সারাৎসার—এর অতিরিক্ত 'ধ্বনি'র কোনো অস্তিত্বই নেই। অবশ্য

পরবর্তী সময়ে আচার্য অভিনব গুপ্ত তাঁর "ধ্বন্যালোক লোচনে" ধনিকের "তাৎপর্যবাদ" কে খণ্ডন করে ধ্বনিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তবু ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে ধনঞ্জয়-ধনিক রচিত ত্রয়ী গ্রন্থের (দশরূপক, অবলোক এবং কাব্যনির্ণয়) অম্লান অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য।

দশম শতাব্দের শেষ দিকে (কেউ কেউ মনে করেন একাদশ শতাব্দের প্রথম দিকে) আচার্য কুন্তক ও অভিনব গুপ্ত কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কুন্তক আগে না অভিনব গুপ্ত আগে এ সম্পর্কে প্রামাণ্য কোনো তথ্য এখনো অনায়ত্ত। তবে এ দুই প্রাজ্ঞ পণ্ডিত যে খুব কাছা-কাছি সময়ের এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। যেহেতু "ধ্বন্যালোক" প্রসঙ্গে আচার্য অভিনব গুপ্তের নাম উচচারিত হয়েছে বারংবার সেজন্যে এবারে আসা যাক কুন্তক প্রসঙ্গে।

কাশ্মীরবাসী এ পণ্ডিত প্রথাপীড়িত পাণ্ডিত্যকে পরিহার করে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে পাড়ি জমিয়েছিলেন বলেই গুরুবাদী আলঙ্কারিক সমাজে প্রচণ্ডভাবে উপেক্ষিত। ধ্বন্যালোকের প্রবল প্রভাবে আচার্য ভরতের রসবাদের বিপুল প্লাবনে ভারতীয় পণ্ডিতেরা যেখানে জীবন ও কাব্যের, ধর্ম ও দর্শনের তাবৎ প্রস্তাবে শুদ্ধ-আত্মার আনন্দময় স্বরূপ-সন্ধানে ব্রতী, সেখানে কুন্তক অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনি বা রস নয়, "বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ" ব'লে ঘোষণা করলেন তাঁর "বক্রোক্তি-জীবিত"-গ্রন্থে। ("বক্রোক্তি ঃ কাব্যজীবিতম্")। ভারতীয় কাব্য-তত্ত্বের ইতিহাসে কুন্তক নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। কাব্য-বিচারে তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে এ-অধ্যায়ে আমরা তাঁর কাব্যসাহিত্য বিষয়ক মতাবাদের একটু বিস্তৃত বিবরণ দিতে আগ্রহী।

গ্রন্থের প্রারম্ভে কাব্যের সংজ্ঞার্থ প্রদানেই তাঁর স্বতন্ত্র সুর লক্ষণীয়:

"শব্দার্থৌ সহিতো বক্রকবি ব্যাপার শালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহলাদকারিণি।।"

—বক্রোক্তিজীবিত, ১/৭

—মিলিত শব্দার্থযুগল কাব্যেবোদ্ধাদের আনন্দময় বক্রতা-পরিপূর্ণ কবিব্যাপার সমৃদ্ধ রচনাবন্ধে বিন্যস্ত হলে কাব্য হয়ে থাকে।

আচার্য কুন্তকের নিজের উক্তিতেই জানা যায় তিনিই প্রথম প্রত্যয়ের সঙ্গে সাহিত্যর স্বরূপ বিশ্লেষণে উদ্যোগী হয়েছিলেন—"ন পুনরেতস্য কবিকর্মকৌশলকাষ্ঠাধিরূঢ়ি-রমনীয়স্য অদ্যাপি কশ্চিদপি বিপশ্চিদ্ অয়ম্ অস্য পরমার্থ ইতি মনাক্ মাত্রম্ অপি বিচারপদবীম্ অবতীর্ণ:। তদ্ অদ্য সরস্বতীহৃদয়ারবিন্দ-মকরন্দবিন্দুসন্দোহ-সুন্দরাণাং সৎকবি-বচসাম্ অন্তরামোদমনোহরত্বেন পরিস্ফুরদ্ এতৎ সহৃদয়-ষট্চরণ-গোচরতাং নীয়তে।

— বক্রোক্তিজীবিত, ১/১৬ বৃত্তি।

—কবি-কর্মকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি-হেতু রমণীয় এই যে সাহিত্য তার আসল অর্থ কি, তা আজ পর্যন্ত কোনো সুধী সামান্যমাত্রও বিচার করে দেখান নি। সরস্বতীর হৃদয়-পদ্মের মকরন্দবিন্দুসমূহের সৌন্দর্য নিয়ে প্রকাশিত হয় সৎকবিদের বাক্যমালা। তাঁদের সত্তার পরিমলের মনোহারিত্বে প্রস্ফুটিত হয় সাহিত্য। আজ তা সহৃদয় ভ্রমরগণের গোচরীভূত করা হচ্ছে।

কুন্তকের এ ঘোষণায় হয়তো অনেকেই একটা প্রচ্ছন্ন গর্বের ভাব লক্ষ্য করতে পারেন, কিন্তু এ-আত্মপ্রত্যয়ী ঘোষণা যে অকারণ নয় তার প্রমাণ 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থের বহু-স্থানে বিদ্যমান। তিনি সাহিত্যে শব্দার্থের মিলনকেই চরম বিবেচনা করেন নি, স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট্যেরও অনুসন্ধান করেছেন যুগপৎ :

"সাহিত্যম্ অনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতি কাপ্যসৌ।
অন্যূনানতিরিক্তিত্ব—মনোহারিণ্য বস্থিতিঃ॥"

—বক্রোক্তিজীবিত, ১/১৭

— সাহিত্য হচ্ছে ওদের (শব্দার্থ যুগলের) এক লোকাতীত বিন্যাস-ভঙ্গী, যা ন্যূনতা ও বাহুল্যবর্জিত হয়ে হৃদয়গ্রাহী (মনোহারী) এবং সুশোভন (শোভাশালী) হয়ে ওঠে।

গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের চড়াসুর ধরা পড়েঃ

"সাহিত্যার্থ-সুধাসিন্ধোঃ সারম্ উন্মীলয়াম্যহম্।"

অর্থাৎ সাহিত্যার্থরূপ সুধাসিন্দুর সারাৎসার (সার) আমি উন্মোচিত (উন্মীলিত) করবোই।

এবং এ কাব্য-সাহিত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি অক্লান্ত শ্রমের ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর গ্রন্থে। তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করে-ছিলেন যে, সাহিত্য মূলত বিশিষ্টভাবে মিলিত শব্দার্থ-যুগলের মনোহারী বিন্যাসভঙ্গী। এবং এখানে বিশিষ্ট মিলনের অর্থ হচ্ছে, এতে শব্দ ও অর্থ দু-ই সমান হবে, দু-ই সমান শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ক'রে পরস্পরের মিলনে হ'য়ে উঠবে হৃদয়গ্রাহী, মনোতোষ ('পরস্পর স্পর্ধিত রমণীয়')। সুতরাং আচার্য কুন্তকের মতে কেবল 'কবি-কৌশল কমনীয়তা' পূর্ণ শব্দাবলী কাব্য পদবাচ্য নয়, আবার 'রচনাবৈচিত্র্য চমৎকারকারী' অর্থও কাব্য অভিধা বহনকারী নয়।

"বাচকো বাচ্যং চ ইতি দ্বৌ সম্মিলিতৌ কাব্যম্।"

—"বাচক ও বাচ্য দু'য়ের (সার্থক) সম্মিলনে কাব্য হয়।" এখানে বাচক মানে শব্দ অর্থাৎ যা অর্থকে বলে এবং বাচ্য হচ্ছে অর্থ, যা বলা হয়। এরা হচ্ছে—"প্রতিতিলম্ ইব তৈলম তদ্বিদাহলাদ-কারিত্বং বর্ততে।"—অর্থাৎ প্রতিতিলে তেলের মতো (কাব্যরসিকের) আনন্দের কারণ (বর্তমান)।

কুন্তক অবশ্যই সচেতন ছিলেন যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ তো সমস্ত শব্দার্থেই বর্তমান, তাহলে কি তাবৎ শব্দার্থই সাহিত্য নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য? —না তা হতে পারে না, কারণ তাকে সাহিত্য পদবাচ্য হতে হলে "বিশিষ্টম্ এব ইহ সাহিত্যম্ অভিপ্রেতম্।"—অর্থাৎ (শব্দার্থের) বিশিষ্ট সম্বন্ধই সাহিত্য বলে' অভিপ্রেত। সেটা কি ধরনের?

"বক্রতা বিচিত্র-গুণালঙ্কার সম্প্রদাং পরস্পর স্পর্ধাধিরোহঃ।" —বক্রতার সাহায্যে বিচিত্র গুণ অলঙ্কাররূপ সম্পদরাজির পরস্পর স্পর্ধা সহকারে অধিরোহণই উক্ত মিলনের বিশিষ্টতা। এবং এ শব্দ ও অর্থ সবসময়ই তুল্য গুণ এরা সুজন-সুহৃদের মতো একে অন্যের শোভা বাড়িয়ে থাকে।

"সম-সর্ব গুণৌ সন্তৌ সুহৃদৌ ইব সঙ্গতৌ।
পরস্পরস্য শোভায়ৈ শব্দার্থৌ ভবতো যথা।।"
—বক্রোক্তিজীবিত, বৃত্তি।

এবং এই সম্পর্কের হেরফের ঘটলে সাহিত্য-মানেরও বিপর্যয় ঘটবে অনিবার্যভাবে।

অলঙ্কারের আতিশয্যময় যুগের বাসিন্দা হয়েও আচার্য কুন্তকের দৃঢ় প্রতীতি ছিলো যে, শব্দালঙ্কারের বাড়াবাড়ি কাব্যের রূপও স্বরূপকে বিনষ্ট ও বিপর্যস্ত করে। এটা তাঁর মতে কাব্যের 'ঔচিত্য হানি'র নামান্তর।

"ব্যসনিতয়া প্রযত্ন-বিরচনে হি প্রস্তুতৌচিত্য-পরিহাণে বাচ্য-বাচকয়োঃ পরস্পরস্পর্ধিত্ব-লক্ষণ-সাহিত্য-বিরহঃ পর্যবস্যতি।"
—বক্রোক্তিজীবিত, বৃত্তি ২/৪

—অর্থাৎ অত্যধিক আসক্তি হেতু বর্ণগুলো অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রচিত হলে প্রস্তুত (প্রতিপাদ্য) বিষয়ে ঔচিত্যহানি হয় এবং এর জন্যে বাচ্য-বাচকের পরস্পর স্পর্ধিতরূপ সাহিত্যগুণ বিনষ্ট হয়।

সাহিত্যের শব্দও অর্থের স্বতন্ত্র সংজ্ঞার্থে কুন্তক বিশ্লেষণ করেছেন এ-দু'য়ের চারিত্র-লক্ষণ :

"শব্দো বিবক্ষিতার্থৈকবাচকোঽন্যেষু সৎস্বপি।
অর্থ : সহৃদয়াহলাদকারি-স্বস্পন্দসুন্দর:।।"

—বক্রোক্তিজীবিত ১/৯

—অন্য কয়েকটি বাচক থাকলেও যা বিবক্ষিত অর্থাৎ অভিপ্রেত অর্থের একমাত্র বাচক হয়, তা-ই শব্দ। (আর) সহৃদয় হৃদয়ে আনন্দ বা আহলাদ সৃজন ক'রে স্ব-স্পন্দে বা স্বভাবে সুন্দর হয়, তা-ই অর্থ।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কাব্য-সাহিত্যে অর্থ প্রকাশক শব্দ তো অনেকই থাকে, কিন্তু আচার্য কুন্তক তার সবগুলো শব্দকে শব্দের মর্যাদা দিতে নারাজ। তিনি কেবল তা-কেই প্রকৃত শব্দ বলেছেন, যে-শব্দ কবির একান্ত কাঙ্ক্ষিত বিশেষ অর্থকে দ্যোতিত ক'রে কবি ভাবনাকে বাঙময় বা মূর্ত ক'রে তোলে। (এ-যেন Walter Pater-এর ভাষায়,—'The unique word'—অদ্বিতীয় শব্দ।)।

আচার্য কুন্তকের বিশাল-গভীর কাব্য-বিচিন্তা কেবল শব্দ-অর্থে সমর্পিত ছিলো না, তিনি শব্দের সঙ্গীতময় (গীতিধর্ম) দিকের প্রতিও আন্তরিক আকৃষ্ট হয়েছিলেন।—"গীতবৎ হৃদয়াহলাদং তদ্বিদাং বিদধাতি যৎ।" (বক্রোক্তিজীবিত' বৃত্তি)। —অর্থাৎ (সাহিত্যের শব্দ) কাব্যজ্ঞ-দের হৃদয়ে সঙ্গীতের মতো আনন্দ উদ্রেক করে।

তিনি এখানে সঙ্গীতের মতো ব'লতে শব্দের ধ্বনিগত ধর্মকে বুঝিয়েছেন। অর্থ-সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আরো অভিনব এবং প্রশংসনীয়। তিনি তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, কোনো বস্তুর যথাস্থিত যথাদৃষ্টরূপ

কখনো কাব্যের বিষয় হয় না বা হ'তে পারে না. এরজন্যে প্রয়োজন কবিশক্তির সার্থক সাঙ্গীকরণ অর্থাৎ, বাইরের বস্তু কবিচেতনায় ভাবময়-রূপ লাভ করে, কবি-চিত্তে সূচিত হয় আলোড়ন, প্রকাশের ব্যাকুলতায়, সৃজনের অবিনাশী বেদনায় সে বিভাব (অর্থ) বাঙময় (শব্দে সমর্পিত) হ'য়ে ওঠে এবং সে ভাবময় বোধময় শিল্পিত প্রকাশ স্বভাবত আনন্দদায়ক হয় সহৃদয় হৃদয়ে। এবং কবি-চিত্তে ভাব (অর্থ) যখন আন্দোলিত সুন্দরে, শিহরিত সংবেদনায় পরিণত হয়, তখন স্বভাবতই প্রকাশের বাসনায় সৃষ্টিতে (কাব্য-কবিতায়) সঞ্চারিত হয় আকাঙ্ক্ষিত (অভিপ্রেত) দীপ্র শব্দাবলী। অতএব ভাবময় অর্থও দ্যুতিময় শব্দের সার্থক সন্নিপাতে রচিত হয় অনুপম কাব্যসাহিত্য, যা অবশ্যই আচার্য কুন্তকের অভিধায়—'অদ্ভুতা মোদচমৎকার'।

যদি কাব্য সাহিত্যে শব্দ ও অর্থের এ-ধরনের সম্মিলন সম্ভব না হয় তা'হলে তার পরিণাম কি হয়, সে-সম্পর্কেও কুন্তক আদৌ অসচেতন ছিলেন না। "বক্রোক্তিজীবিত"তের বৃত্তিতে তার প্রমাণ মেলে :

"অথ : সমর্থবাচকাসদ্ভাবে স্বাত্মনা স্ফুরন্ অপি-মৃতকল্প এব অবতিষ্ঠতে। শব্দোহপি বাক্যোপযোগিবাচ্যাসম্ভবে বাচ্যান্তর-বাচক: সন্ বাক্যস্য ব্যাধিভূত: প্রতিভাতি।"

—সার্থক (সমর্থবাচক) শক্তিশালী শব্দের অভাব হ'লে অর্থ নিজের মধ্যে বিকশিত (স্ফুরিত) হ'য়েও মৃতের মতো পড়ে থাকে। শব্দও বাক্য প্রার্থিত অর্থের অনটনে ভিন্ন অথ বুঝিয়ে বাক্যের 'ব্যাধি-ভূত'এ পরিণত (প্রতিভাত) হয়।

অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য হ'চ্ছে, কাব্য-সাহিত্যের ভাবে (অর্থে) প্রাণ-সঞ্চার করতে পারে সমুচিত শব্দ এবং শব্দের অসুখ (ব্যাধিভূত) হরণ করতে সক্ষম সমুচিত অর্থ। আচার্য কুন্তকের মতে তাই শব্দ ও অর্থের বিশিষ্ট সম্বন্ধেই নির্মিত হয় প্রকৃত কাব্য-সাহিত্য। ফলে

কবির দায়িত্ব কেবল যথেচ্ছ শব্দ সংগ্রহ নয়, সৌষ্ঠবময়, শক্তিশালী, অভিপ্রেত শব্দ নির্বাচন এবং তার ধ্বনি-ধর্ম ও ভাব-ধর্ম অনুসারে কাব্য-শরীরে যথারীতি সংস্থাপন।

তাবৎ সংস্কৃত কাব্য-তাত্ত্বিকদের শিল্পদৃষ্টি যেখানে চিরন্তনত্বের অলিখিত সূত্রে আবদ্ধ এবং অলৌকিক অবাঙগোচরত্বের কাছাকাছি, সেখানে কুন্তকের ব্যতিক্রমী সাহসী দৃষ্টিতে আমরা চমৎকৃত না হ'য়ে পারি নে। তিনি তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে কখনো প্রত্যক্ষ স্পষ্ট-ভাবে কখনো পরোক্ষ-ইঙ্গিতে অস্পষ্টভাবে কাব্যে কবির স্বকীয় সার্বভৌম শক্তির প্রতি আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

কাব্য-সাহিত্যে 'বিচ্ছিত্তি' বা 'বৈচিত্র্য' তার মূলে রয়েছে কবির প্রতিভা বা কবি-চেতনার স্বাতন্ত্র্য। এবং এ-'বিচ্ছিত্তি' (বৈচিত্র্য)-হেতু কাব্যে প্রযুক্ত অলঙ্কার উপমাদি নির্বিশেষ না হয়ে সবিশেষ হ'য়ে ওঠে। সমগ্র কবি-কর্ম মূলত কাব্য-নির্মাতার বিশিষ্ট কাল্পনাশক্তি-প্রসূন এবং এ-স্বতন্ত্র কবিশক্তিই সৃষ্টিকর্মে তাঁর ভাষায় 'বক্রতা' নির্মাণ করে। প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকদের ক্ষুরধার নৈয়ায়িক বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রেও বিনীতভাবে-এ-কথা উচ্চারণ হয়তো অকারণ নয় যে, তাঁরা কবির সমগ্র সত্তার, পুরো কবি-ব্যক্তিত্বের কিংবা গোটা কাব্যের সার্বিক রূপকে ততোটা গুরুত্ব দেন নি, যতোটা প্রাধান্য দিয়েছেন, আংশিক ক্ষমতার (কাব্য-নির্মাতার) কিংবা খণ্ডিত বাক্য বা বিচ্ছিন্ন কাব্যাংশের। এজন্যেই কাব্যবিচারের মৌলিক বিষয়ে (যেমন কাব্যের আত্মা অনুসন্ধানে) তাঁরা প্রায়শ শরণাপন্ন হয়েছেন, কখনো কাব্যের শব্দ, অলঙ্কার বা বাক্যের কাছে। (স্মর্তব্য: "রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।" শব্দার্থৌ সাহিতৌ কাব্যম।" "কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ।" কিংবা "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।" ইত্যাদি উক্তি।)

অর্থাৎ সমগ্র কবিতা বা কাব্য নয় (কবির সমগ্র রচনাবলী তো নয়ই) একটি বাক্য বা শ্লোক কিংবা শ্লোকার্ধ, আবার কখনো শব্দ বা কতিপয় অলঙ্কারের নিদান থেকে তাঁরা কাব্যের বিধান দিতে চেয়েছেন। সে-ক্ষেত্রে আচার্য কুন্তক বাক্য বা শব্দ নয়, বিচ্ছিন্ন অলঙ্কার, রীতি, রস কিংবা বক্রবাক্যও নয়—'বক্রোক্তি'কে কাব্যের আত্মা নয় জীবন ব'লে ঘোষণা করলেন। (বক্রোক্তিঃ 'কাব্যজীবিতম্।) অর্থাৎ কাব্য-সংজ্ঞার্থ বিবেচনায় কেবল শব্দ, বাক্য নয়, শ্লোকের কিংবা শ্লোকার্ধের উজ্জ্বল উপমা-উৎপ্রেক্ষাও নয়, কাব্যের সমগ্র উক্তি প্রধান হ'য়ে উঠেছে। এবং কাব্যের কথা বা উক্তি সর্বদাই বিশিষ্ট, অসামান্য অ-সাধারণ এক ধরনের বক্র বা অ-সহজ কথাতো বটেই। কুন্তক সেই অ-সাধারণ অ-সরল উক্তিকেই বলেছেন 'বক্রোক্তি'।

আমরা জানি সব দেশে সবকালেই কাব্যের সিদ্ধি অবশ্যই উক্তি নির্ভর, কারণ সর্বকালের কাব্য-কবিতা তো কখনোই কেবল কবির মানসিক প্রক্রিয়া নয়, উক্তিই হয়ে থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তিনি কাব্যের সমগ্র উক্তির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাঁর অম্লান স্বাতন্ত্র্যই ঘোষণা করেছেন।

কুন্তকের 'বক্রোক্তি' কোনো সুনির্দিষ্ট ভঙ্গী বা অলঙ্কার নয়, তা যে কোনো চিত্তাকর্ষক চমৎকার রচনা প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য হতে পারে। তাঁর মতে 'ভঙ্গী ভণিতিরম্যতাই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কুন্তক কথিত এ-ভঙ্গীর সঙ্গে রীতিবাদীদের রীতি বা ভঙ্গীর সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান। কারণ আমরা জানি, ভারতীয় অলঙ্কারিকেরা রীতি বা ভঙ্গী বলতে বুঝিয়েছেন বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাদর্শের নির্ধারিত বিশিষ্ট ঢঙকে। (যথা-গৌড়ী, পাঞ্চালী, বৈদর্ভী। লাটিয়া, মাগধী ইত্যাদি রীতি।) কুন্তক-বর্ণিত ভঙ্গীতে লেখক নিজের ব্যক্তিত্বকেই বিজ্ঞাপিত করে থাকেন। এবং তাঁর বক্রোতায় প্রধানভাবে প্রত্যাশিত

কবি ভাষা ও উক্তির ক্ষেত্রে প্রথা-পীড়িত পথকে পরিহার করে নোতুনত্বকে অনিবার্য করে তুলবেন এবং বৈচিত্র্য সম্পাদন করবেন যুগপৎ। ফলে তাঁর বক্তব্যের প্রধান প্রবণতায় ধরা পড়ে প্রাচীনকে অঙ্গীকার করা নয় বরঞ্চ প্রবলভাবে অস্বীকার করার আকাঙ্ক্ষা।

সুতরাং কুন্তককে ভারতীয় কাব্য-তত্ত্ব-বিচারের ধারাবাহিক বাতা-বরণে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি যেন প্রাচীন যুগেরই একজন আধুনিক কাব্য-সমালোচক। (কতিপয় সীমা-বদ্ধতা সত্ত্বেও।) এবং কুন্তকের এ-বিপ্লবী দৃষ্টি ভঙ্গীর কারণেই হয়তো ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকেরা তাঁকে এতোদিন উপেক্ষায় অনালোকিত রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু কুন্তক শত বাধা অতিক্রম করে আলোকিত হয়ে উঠেছেন তাঁর দীপ্র-সাহিত্য-বোধের উজ্জ্বল ঘোষণায় :

"শরীরং জীবিতেনেব স্ফুরিতেনেব জীবিতম্।
বিনা নির্জীবিতাং যেন বাক্যং যাতি বিপশ্চিতাম্।।"

—বক্রোক্তিজীবিত, বৃত্তি।

প্রাণশক্তি ব্যতিরেকে শরীরের, অথবা স্পন্দন ভিন্ন প্রাণশক্তির যে-রকম অবস্থা হয়, সাহিত্যের স্ফুরণ না হলে সুধীগণের বাক্যও সে-রকম নির্জীবতা পেয়ে থাকে।

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে দীপ্তিমান অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ, নানা বিষয়ে প্রাজ্ঞ প্রণ্ডিত অভিনব গুপ্ত। তিনি দশম শতাব্দের শেষ দিকের ও একাদশ শতাব্দের প্রথমভাগের লোক, তাঁর লেখা থেকেই এ তথ্য পাওয়া যায়। 'ধ্বন্যালোক' নামের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যেমন আচার্য আনন্দবর্ধনের নাম জড়িত, তেমনি অভিনব গুপ্তের নাম ব্যতিরে-কেও সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বস্তুত 'ধ্বন্যালোক' মানে যেন ছন্দে রচিত অলঙ্কারশাস্ত্র (পদসংখ্যা সবশুদ্ধ ১১৬), তার সঙ্গে আনন্দ বর্ধনের "আলোক' (বৃত্তি বা ব্যাখ্যা) এবং অভিনব গুপ্তের 'লোচন'

(ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা),—"ধ্বনিবাদের শৈশব, কৈশোর আর পূর্ণযৌবন" অর্থাৎ কাব্যতত্ত্বে ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে ধ্বন্যালোকের সূচনা এবং আনন্দবর্ধনের আলোকের সাহায্যে যার বিকাশ, তারই প্রত্যাশিত পূর্ণতা দানের জন্যে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে অভিনব গুপ্ত এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি ভরত মুনির 'নাট্যশাস্ত্রে'রও অন্যতম প্রধান ভাষ্যকর হিসেবে পরিচিত। তাঁর এ ঐতিহাসিক ভাষ্যের নাম 'অভিনব-ভারতী রসতত্ত্ব-বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন 'অভিব্যক্তি-বাদী। "বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী ব্যঞ্জনায় ক্ষণকালের জন্য নির্মলীকৃত 'চিৎ'-এ অভিব্যক্ত সহৃদয় পাঠকের স্বানন্দই রস—এ হলো অভিব্যক্তিবাদের স্থূল এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়। "(—শ্যামাপদ চক্রবর্তী, অলঙ্কার চন্দ্রিকা, পৃঃ ৩১৫)।

আনন্দবর্ধনের প্রায় একশ' বছর পরে অভিনব গুপ্ত 'লোচন' রচনা করেন। মূল ধ্বন্যালোকের বা ধ্বনিকারিকার কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করেন আনন্দবর্ধন, পরে মূলের এবং 'আলোকে'র (বৃত্তির) অসামঞ্জস্য দূর করে প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত অভিনব গুপ্ত তাঁর লোচনে' (টীকায়) তাবৎ বিষয়কে দীপ্তিমান করে তোলেন। এবং কাব্যতত্ত্বে রস-ধ্বনি-বাদের সার্থক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সর্বপ্রধান আচার্যের সম্মানে ভূষিত হন। বিরল প্রতিভা, অসাধারণ মনীষার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অভিনব গুপ্ত বিরুদ্ধবাদীদের মতামত সম্পর্কে কিছুটা অসৌজন্যমূলক অসহিষ্ণু ছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। কতিপয় উক্তির মধ্যে তাঁর এ অসহিষ্ণু মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। যেমন ধ্বনিবাদের অস্তিত্বে যারা অবিশ্বাসী, তাঁদের সম্পর্কে তাঁর ক্ষমাহীন উচ্চারণ—"অপারং মৌর্খ্যম্ অভাববাদিনাম্" —অর্থাৎ অপার (অসীম) মূর্খতা ওই অভাববাদীগুলোর। তারপরেই তিনি তাঁদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, —"ন চ অস্মাভিঃ অভাববাদিনাং বিকল্পা শ্রুতা, কিন্তু

সম্ভাব্য দষয়িষ্যন্তে, অতঃ পরোক্ষত্বম্।"- এর ভাবার্থ হচ্ছে, ওরা (বিরুদ্ধবাদীরা) কি বলেছে আর না বলেছে, তা অবশ্য আমাদের শোনা নেই, তবে কি বলা ওদের পক্ষে সম্ভব, সে-সব কল্পনা ক'রে নিয়েই ওদের দোষ দেখিয়ে দেবো। নিঃসন্দেহে এ উচ্চারণ প্রজ্ঞা-প্রসূন নয়, বরঞ্চ বহুলাংশে কাব্যতত্ত্ব-বিচারের ন্যায় (Logic) বিরোধী এবং অহংবোধ-জাততো বটেই। আসলে অভিনব গুপ্তের আত্ম-প্রত্যয়ী পাণ্ডিত্যই হয়তো মাঝে মধ্যে তাঁকে পরমত-অসহিষ্ণু অহংকারী করে তুলেছে। তবে এ সব সত্ত্বে ও তাঁর অনুপম প্রজ্ঞায় প্রোজ্জ্বল সিদ্ধান্তমালা এবং সুগভীর রসদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ-ধী বিশ্লেষণ ক্ষমতা ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে তাঁকে সম্মানের অধিকারী করেছে। এবং কাব্যতত্ত্বের পাঠকমাত্রে স্বীকার করবেন, 'লোচন' – এর অন্তিমে আচার্য অভিনব গুপ্তের দর্পিত উচ্চারণ অকারণ নয়ঃ

"বাক্য প্রমাণপদবেদিগুরু: প্রবন্ধ—
সেবারসো ব্যরচয়দ্ ধ্বনিবস্তুবৃত্তিম্ ॥"

—অর্থাৎ মীমাংসা-ন্যায়-ব্যাকরণতত্ত্বজ্ঞদের গুরু আমি প্রবন্ধ-সেবারস অভিনব গুপ্ত ধ্বনিতত্ত্ব রচনা সমাপ্ত করলাম।

সুতরাং আনন্দবর্ধনের পরে একশ বছর ধ'রে যে ধ্বনিবাদ ছিলো অবিকশিত, সীমাবদ্ধ তাকে আচার্য অভিনব গুপ্ত ব্যাপক বিস্তারে অভিষিক্ত করলেন সার্থকভাবে। বস্তুত ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে ধ্বনিবাদের অগ্রযাত্রার তিনিই সর্ব-প্রধান হোতা।

কিন্তু অভিনব গুপ্তের এ ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম এগিয়ে এলেন তিনি আচার্য মহিম ভট্ট। একাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে অভিনব গুপ্তের স্বদেশভূমি কাশ্মীরেই তিনি 'ধ্বনিবাদ'কে বাধা প্রদান করলেন প্রবলভাবে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম 'ব্যক্তিবিবেক'। গ্রন্থের সূচনাতেই তিনি ঘোষণা করলেন: "অনুমানেঽন্তর্ভাবং সর্বস্যৈব

ধ্বনেঃ প্রকাশয়িতুম্। ব্যক্তিবিবেকং কুরুতে প্রণম্য মহিমা পরাং বাচম্॥"—ব্যক্তিবিবেক, ১/১ অর্থাৎ তাবৎ (সবরকম) 'ধ্বনি'ই অনুমানের আওতাধীন এ তত্ত্ব প্রকাশ করার জন্যে তিনি 'পরা-বাক'কে প্রণাম জানিয়ে রচনা করেছেন 'ব্যক্তিবিবেক।' 'ন্যায়-দর্শনের পদাঙ্ক অনুসারী এ পণ্ডিতের বিচারে রসই কাব্যের আত্মা। রসতত্ত্বে তিনি ছিলেন অনুমিতিবাদী। রস তাঁর বিচারে ব্যঙ্গ্য বা প্রতীয়মান নয়, এটা একান্তভাবে সাধ্য অর্থাৎ অনুমেয়। তাঁর মতে শব্দের ব্যঙ্গ্যঅর্থ বলে কিছু নেই, আছে কেবল বাচ্য আর অনুমেয় অর্থ। মহিমভট্ট আচার্য কুন্তকের বক্রোক্তির ও আলাদা কোনো মর্যাদা দেন নি তাঁর গ্রন্থে। তাঁর মতে কাব্যে বিভাব অনুভাব, সঞ্চারীভাব ইত্যাদি বাচ্যরূপে অনুমানের মাধ্যমে অনুমেয় হিসেবে 'রস'কে ব্যক্ত করে এবং এ মত 'ব্যক্তি' (প্রকাশ) হয়েছে ব'লেই তাঁর গ্রন্থের নাম 'ব্যক্তিবিবেক'।

একাদশ শতাব্দের শেষ দিকে কাশ্মীরবাসী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র রচিত দু'খানি কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থে সন্ধান পাওয়া যায়। (কবিকণ্ঠাভরণ' আর ঔচিত্যবিচার চর্চা')। তাঁর গ্রন্থে 'ধ্বন্যালোকের কারিকার উদ্ধৃতি এবং আনন্দবর্ধনের নামোল্লেখ থাকলেও তিনি ধ্বনিবাদকে স্বীকার করেন নি। কাব্যতত্ত্বে তিনি রসবাদী হিসেবেই পরিচিত। তাঁর মতে কাব্যের আত্মা' ঔচিত্য' (Propriety)—"ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্"।—ঔচিত্যই রসসিদ্ধ কাব্যের প্রাণ বা আত্মা।

তাঁর বিবেচনায় কাব্যের পদ, বাক্য, গুণ, অলঙ্কার এবং রসাদি সমস্ত কিছু বিশ্লেষিত হবে এ ঔচিত্যে'র কষ্টিপাথরে। অর্থাৎ বিচার করতে হবে প্রাগুক্ত বিষয়গুলো কবির বক্তব্যের একান্ত অনুকূল, অনুগত এবং সমুচিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে তবে সার্থক কাব্য, তা না হলে আদৌ কাব্য পদবাচ্য নয়।

ভোজরাজ বা ভোজদেব মালবের অধিবাসী (নৃপতি) ছিলেন। তিনি ক্ষেমেন্দ্রের সমসাময়িক কাব্যতাত্ত্বিক। এবং 'রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনা অনুসারে কাশ্মীররাজ অনন্তদেব এবং মালবাধিপতি ভোজদেব একই সময়ের ও স্বভাবের (যেমন, দানশীল, কবি ও কবিসুহৃদ) মানুষ ছিলেন।

ভোজদেবের বিখ্যাত গ্রন্থ 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ'। তিনি 'ধ্বনি-বাদ'কে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে :

"নির্দ্দোষং গুণবৎ কাব্যম্ অলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্ব্বন্ কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ বিন্দতি ॥"

সরস্বতী কণ্ঠাভরণ।

এর ভাবার্থ হচ্ছে—প্রকৃত কাব্যকে হতে হবে দোষহীন (গ্রাম্যতা ইত্যাদি), গুণযুক্ত (মাধুর্যাদি), অলঙ্কারে সুশোভিত (অনুপ্রাস-উপমাদি) এবং রসে অন্বিত (শৃঙ্গারাদি)। তাহলেই কাব্যনির্মাতা কবিখ্যাতি এবং (পাঠক) প্রীতি লাভে ধন্য হন।

ভোজরাজ পূর্বাচার্যদের (দণ্ডী, বামন, রুদ্রট প্রমুখ) অলঙ্কার-বিষয়ক, গুণ, এবং রস সম্পৃক্ত বহু মতামত প্রয়োজনবোধে নিজ চেতনার আলোকে পরিশোধিত করে প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর গ্রন্থে। এজন্যেই সরস্বতী কণ্ঠাভরণ'-এর ঐতিহাসিক মূল্য আজও অম্লান।

ভোজরাজের পরবর্তী বিখ্যাত কাব্যতাত্ত্বিক মম্মটভট্ট ধ্বনিবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর রচিত সুকঠিন কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থের নাম 'কাব্যপ্রকাশ'। তাঁর গ্রন্থে ভোজরাজের উল্লেখ থাকায় বোঝা যায়—তিনি তাঁর পরবর্তী সময়ের (ভোজনৃপতেস্তৎ ত্যাগলীলায়িতম্")। ধ্বনিবাদের প্রচারে ও প্রসারে তাঁকে অনেকেই আচার্য অভিনব গুপ্তের 'দক্ষিণ-হস্ত' বিবেচনা করেন। ধ্বন্যালোকের অনুসরণে তিনি কাব্যকে তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিভাজনের পক্ষ-

পাতী ছিলেন (ধ্বনিকাব্য, গুণীভূত ব্যঙ্গ্য আর চিত্রকাব্য)। আচার্য মম্মটভট্টের মতে ঃ "অদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণৌ অনলঙ্কৃতি পুনঃ ক্বাপি।" ১/৫ অর্থাৎ নির্দোষ, গুণান্বিত, কোথাও বা অনলঙ্কৃত শব্দার্থের (শব্দ + অর্থ) নাম কাব্য।

তবে অনলঙ্কৃত বলতে তিনি অলঙ্কারহীনতা বোঝাতে চান নি, তিনি বলেছেন, অলঙ্কার ব্যতিরেকে কাব্য হয় না ঠিকই তবে কোথাও যদি অলঙ্কার অমূর্ত বা অস্ফুট থাকে তবে কাব্যের ক্ষতি হয় না। (সর্ব্বত্র সালঙ্কারৌ, ক্বচিৎ তু স্ফূটালঙ্কারবিরহে আপনি কাব্যত্ব-হানি ঃ")। তিনি তাঁর গ্রন্থে কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবৃত করেছেন ঃ

"কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতর-ক্ষতয়ে।
সদ্য ঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তসম্মিততয়োপদেশযুজে।।
—কাব্যপ্রকাশ, ১/২

—কাব্য রচিত হয় যশের জন্যে, অর্থের জন্যে, লোক-ব্যবহার শিক্ষার (পরিজ্ঞান) জন্যে, অকল্যাণ বিনাশের জন্যে, পরম আনন্দ লাভের হেতু এবং কান্তা-সম্মিত উপদেশ প্রয়োগ নিমিত্ত।

সুতরাং আচার্য মম্মট ভট্টের মতে আনন্দময় শব্দার্থযুগলই 'কাব্যের সারাৎসার।

আচার্য মম্মট ভট্টের পর উল্লেখযোগ্য কাব্যতাত্ত্বিক রুয্যক। দ্বাদশ শতাব্দের এ পণ্ডিত ছিলেন কাশ্মীরবাসী। কাব্যতত্ত্ব বিচারে তিনি ধ্বনিবাদী-গোষ্ঠীভুক্ত। আচার্য রুয্যকের প্রথম রচনা 'কাব্যপ্রকাশসঙ্কেত (মম্মটভট্ট রচিত কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থেরটীকা)। কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে তাঁর মৌলিক এবং শ্রেষ্ঠ সংযোজন "অলঙ্কার সর্ব্বস্ব" গ্রন্থ।

ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিক হিসেবে খ্যাতিমান এ কাব্যতাত্ত্বিক তাঁর "অলঙ্কার সর্ব্বস্ব"তে সূত্র-রচনায় এবং বিচার বিশ্লেষণে কোথাও

কোথাও 'কাব্যপ্রকাশ' এবং 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থদ্বারা প্রভাবিত। তিনি এ গ্রন্থে সার্বিক কাব্যশাস্ত্র বিষয়ের বিশদ আলোচনায় না গিয়ে, বেছে নিয়েছেন কেবল শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারকে।

কেবল অলঙ্কারের আলোচনায় রুয্যক নিজেকে ব্যাপৃত রাখলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, কাব্য-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি গভীর ও যুক্তিনিষ্ঠ। বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা নিয়ে তিনি বিবিধ অলঙ্কারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন তাঁর অলঙ্কার সর্ব্বস্বতে। অর্থালঙ্কার বিচারের ক্ষেত্রে রুয্যক প্রধানত লক্ষণামূল্য ব্যঞ্জনার পথ অবলম্বন করেছিলেন। একাধিক কারণে তাঁর অলঙ্কার সর্ব্বস্ব ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব পাঠকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

দ্বাদশ শতাব্দের আরো একজন খ্যাতিমান কাব্যতাত্ত্বিক হেমচন্দ্র। তাঁর নামে পরিচিত 'কাব্যানুশাসন' মূলত একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ। তাঁর এ-গ্রন্থে পূর্বাচার্যদের কাব্য বিচারের অভিমতসমূহ সংগৃহীত হয়েছে বলে এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। হেমচন্দ্রের 'কাব্যানুশাসনে' ঊনত্রিশটি অর্থালঙ্কারের অপূর্ব আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এবং পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের কাছে এ-গ্রন্থ একাধারে সঙ্কলন ও কাব্য-শাস্ত্রের অভিধানের মর্যাদা পেয়েছে।

হেমচন্দ্রের এ গ্রন্থে কাব্যসংজ্ঞার্থে রসকে বাদ দিলেও অলঙ্কা-রাদি আলোচনা প্রসঙ্গে রসের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে একাধিকবার। কাব্যের 'দোষ' নির্ণয়েও তিনি রস ও ধ্বনি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন 'কাব্যানুশাসনে'। কাব্যের উদ্দেশ্য বর্ণনায় তিনিও মম্মট ভট্টের মতো উচ্চারণ করেন :

"কাব্যমানন্দায় যশসে কান্তাতুল্যোপদেশায় চ।"

—কাব্যানুশাসন, ১/৩

— অর্থাৎ কাব্য রচিত হয় আনন্দের জন্যে, যশের কারণে এবং কান্তাতুল্য উপদেশ লাভের নিমিত্তে।

ত্রয়োদশ শতাব্দের খ্যাতিমান কাব্যতাত্ত্বিক দ্বিতীয় বাগভট, জয়দেব, বিদ্যাধর ও বিদ্যানাথ।

দ্বিতীয় বাগভট রচিত কাব্যতত্ত্বের নামও 'কাব্যানুশাসন'। তাঁর এ গ্রন্থটি অর্থালঙ্কারের ব্যাপক-বিশদ আলোচনার জন্যে সমধিক খ্যাতি অর্জন করে। 'কাব্যানুশাসনে' মোট বাষট্টি প্রকার অর্থালঙ্কারের আলোচনা রয়েছে।

মনীষী জয়দেব রচিত কাব্যশাস্ত্রের নাম 'চন্দ্রালোক'। গ্রন্থটির আকৃতি ক্ষুদ্র কিন্তু প্রকৃতি গভীর-সুন্দর ও ব্যাপক। অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ এ জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব' নাটক প্রাচীন ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের এক উল্লেখ্য সংযোজন। কাব্যতত্ত্ব, ন্যায়-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নাট্যকার এ-জয়দেবই 'পীযূষবর্ষ' জয়দেব নামে প্রসিদ্ধ (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা জয়দেব কিন্তু এ জয়দেব নন)। বিশ্বনাথ কবিরাজ জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব' নাটক থেকে উদাহরণ উৎকলিত করেছেন তাঁর 'সাহিত্য-দর্পণ' গ্রন্থে। এবং পরবর্তীকালে অপ্পয়দীক্ষিত 'চন্দ্রালোক' এর অলঙ্কার-অংশের ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'কুবলয়ানন্দ-কারিকা'য়। বস্তুত 'পীযূষবর্ষ' জয়দেব ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে এক স্মর্তব্য ব্যক্তিত্ব।

বিদ্যাধর 'একাবলী' গ্রন্থের রচয়িতা। কাব্যতত্ত্বে তিনি ধ্বনিবাদী এবং 'বক্রোক্তিজীবিতবাদ বিরোধী। তাঁর মতে—'স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভেদাৎ আত্মানন্দসমুদ্ভবঃ।" —অর্থাৎ কাব্যার্থেরভেদহেতু পাঠকের বিচিত্র আত্মানন্দ হ'তেই (বিচিত্র) স্বাদের (শৃঙ্গারাদি নানারসের) জন্ম।

বিদ্যানাথ ও বিদ্যাধরের মতো কাব্যতত্ত্ব-বিচারে ধ্বনিবাদের ঘনিষ্ঠ সমর্থক এবং স্বাভাবিক কারণেই 'বক্রোক্তিবাদ বিরোধী। তাঁর মতে—'শব্দার্থৌ' হচ্ছে কাব্যের দেহ বা শরীর এবং "ব্যঙ্গ্যবৈভম্" হলো তার জীবন বা প্রাণ।

এরপর চতুর্দশ শতাব্দের কীতিমান কাব্যতাত্ত্বিক সিংহভূপাল, ভানুদত্ত এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ।

'রসার্ণবসুধাকর' সিংহভূপাল রচিত বিখ্যাত রসশাস্ত্র। এ-ধারায় ভানুদত্তের 'রসতরঙ্গিণী' এবং 'রসমঞ্জরী'কে ও রসতত্ত্ব-বিষয়ক উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ বলা যায়। এ-ত্রয়ী গ্রন্থ রসের (শৃঙ্গারাদি) বিশদ-গভীর আলোচনার জন্যে পরবর্তীকালের সহৃদয় পাঠক-সমাজকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। চতুর্দশ শতাব্দের সবচেয়ে খ্যাতিমান কাব্যতাত্ত্বিক 'সাহিত্য-দর্পণ' প্রণেতা আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ। মনীষী ভরত থেকে ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে যে রসবাদের সূচনা, বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহি্য-দর্পণে' যেন তারই পূর্ণতা-প্রাপ্তি। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" (সাহিত্যদর্পণ ১/৩) এটি তাঁরই অবিস্মরণীয় উক্তি। – রসাত্মক বাক্যই কাব্য'– একথা উচ্চারণ করেই তিনি কাব্য-বিচারের ইতি টানেন নি, 'সাহিত্যদর্পণে' শ্রব্যকাব্য এবং দৃশ্যকাব্যের ঈর্ষণীয় তাত্ত্বিক আলোচনাও সন্নিবেশিত করেছেন অনুপম দক্ষতার সঙ্গে। ধ্বনিকে কাব্যের আত্মারূপে বিশ্বনাথ স্বীকৃতি দেন নি, তবে তিনি তাঁর গ্রন্থে ধ্বনি এবং গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে ধ্বনিকে উত্তম কাব্য বলতে দ্বিধা করেন নি। ("বাচ্যাতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে ধ্বনিস্তৎ কাব্যমুত্তম্")। তিনি কাব্যের উৎকর্ষ-বিধায়ক ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অলঙ্কার, রীতি এবং গুণকে আর দোষকে বলেছেন কাব্য-বিনষ্টির কারণ। তিনি অলঙ্কারকে বলেছেন, রসভাবের উপকারী, অত্যন্ত শোভাকর, শব্দার্থের অনিত্য বা অস্থির ধর্ম। তিনি 'সাহিত্য-দর্পণে' ছয়টি শব্দালঙ্কার এবং সত্তরটি অর্থালঙ্কারের নিপুণ আলোচনায় তাঁর প্রজ্ঞার স্বাক্ষর মুদ্রিত করেছেন বিস্ময়করভাবে। অলঙ্কার বিষয়ে তাঁর স্মর্তব্য উক্তি হচ্ছে :

"শব্দার্থযোরস্থিরা যে ধর্ম্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ
রসাদীন উপকুর্ব্বোন্তহলঙ্কারাস্তেহঙ্গদাদিবৎ ৷৷"

অর্থাৎ এরা অত্যন্ত শোভাকর, রসভাবের উপকারী, শব্দার্থের অস্থির ধর্ম এবং অঙ্গনা-দেহের আভরণের মতো।

সে-যাহোক আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রদত্ত কাব্য-সংজ্ঞার্থ 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম'---পরবর্তী-কালের বহু কাব্যতাত্ত্বিক এবং কাব্যনির্মাতাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে, এ-কথা অস্বীকারের উপায় নেই।

আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজের পর প্রায় দু'শো বছরের ব্যবধানে কবি কর্ণপুর গোস্বামী ও অপ্পয়দীক্ষিত কাব্যতত্ত্ব আলোচনায় তাঁদের নাম সংযোজিত করেন।

পণ্ডিতদের অনুমান, ষোড়শ শতাব্দের সপ্তম দশকে চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ বাঙালী কাব্যতাত্ত্বিক ও নাট্যকার পরমানন্দ (দাস) সেন (এরই অপর নাম কবি কর্ণপুর গোস্বামী) রচনা করেন 'অলঙ্কারকৌস্তভ' গ্রন্থ। কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত নানা বিষয়ের (গুণ, রীতি, অলঙ্কার, রস ইত্যাদি) বিশদ আলোচনায় 'অলঙ্কারকৌস্তভ' সমৃদ্ধ হলেও এটি মূলত একখানি ভক্তিশাস্ত্র হিসেবেই সমধিক পরিচিত।

কাব্যের রস সম্পর্কে কবি কর্ণপুরের প্রজ্ঞা-প্রসূন অভিনব বিশ্লেষণ এ-যুগেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে রস এক এবং অভিন্ন, স্থায়ী ভাবও মূলত একটি, তা রজঃ এবং তমোগুণযুক্ত সত্ত্বগুণান্বিত চিত্তের আনন্দময় অবস্থা মাত্র। তিনি এ-স্থায়ী ভাবকে অভিহিত করেছেন 'আস্বাদাঙ্কুরকন্দ বা আনন্দ' রূপে। (আস্বাদ এখানে রসাস্বাদরূপ অঙ্কুরের যা কন্দ অর্থাৎ বীজ, তাই স্থায়ীভাবে এবং সে-ভাবই পরিণত হয় রসে)। একটা চমৎকার উদাহরণের সাহায্যে তিনি তাঁর বক্তব্যকে

স্পষ্ট করে তুলেছেন: "--যে প্রকার এক স্ফটিকই জবাকুসুম প্রভৃতি নানা পদার্থের সঙ্গ-হেতু কখন রক্ত, কখন পীত, কখনও বা শ্যাম প্রভৃতি বিবিধ আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ একই স্থায়িরূপ ধর্ম অর্থাৎ স্থায়ী ভাব বীররসাদির পোষাক নানাবিধ বিভাবের সঙ্গ-হেতু কখন উৎসাহ, কখন বিস্ময়, কখনও বা শোকরূপ বিবিধ আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" (ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্তের অনুবাদ, কাব্যালোক, পৃ: ৯২)।

বস্তুত: রস একটিমাত্র এবং স্থায়ীভাবও একটি প্রকৃতি-বিকৃতির সরণী ধরে অন্য-সব ভাব ও রসের প্রকাশ হয়ে থাকে কবি কর্ণপুরের এ ধরনের মতবাদ ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

ষোড়শ শতাব্দের শেষদিকে আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন ব'লে পণ্ডিতদের অনুমান। কাব্যতত্ত্ব-বিচারে তিনি ছিলেন ধ্বনিবাদের সমর্থক। তাঁর বিখ্যাত কাব্যতত্ত্বের গ্রন্থ 'কুবলয়ানন্দ' এবং 'চিত্রমীমাংসা'। কুবলয়ানন্দ-কারিকা'য় তিনি অলঙ্কার-সমূহের গভীর-সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় বিধৃত করেছেন। আর 'চিত্রমীমাংসা'র প্রধানতম আকর্ষণ কতিপয় সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের অনুপম আলোচনা। যেহেতু 'চিত্র'-দৃষ্টির আলোকে আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত এ অলঙ্কারসমূহের জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ করেছেন। তাই তাঁর এ গ্রন্থের নাম 'চিত্র-মীমাংসা'। তবে গ্রন্থখানির বিষয়-বস্তুর গভীরতায় এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক-ভাবেই 'অল্প-বিস্তর অসরল'। তার মতে কাব্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত: (ক) ধ্বনিকাব্য (বাচ্যাতিশয়ী হ'লে) (খ) গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য (বাচ্য-অনতিশায়ী অর্থাৎ বাচ্যই প্রধান আর ব্যঙ্গ্য গৌণ হ'লে) এবং (গ) চিত্রকাব্য (বাচ্য ব্যঙ্গ্যহীন অথচ সুন্দর হ'লে)।

আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত ন্যায় এবং দর্শন শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। 'সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ' 'ন্যায়মুক্তাবলী' প্রভৃতি বৈদান্তিক দর্শনগ্রন্থের রচয়িতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সমধিক।

অবশ্য তাঁর 'চিত্রমীমাংসা'য় প্রদত্ত অনেক যুক্তি ও সিদ্ধান্ত পরবর্তী-কালে খণ্ডিত হয়েছে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের 'চিত্রমীমাংসাখণ্ডনম' গ্রন্থে।

সপ্তদশ শতাব্দের দীপ্তিমান কাব্যতাত্ত্বিক মাদ্রাজের (তামিলনাড়ু) পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। তাঁর রচিত কাব্য (সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকোর যশ-বর্ণনাত্মক কাব্য 'জগদাভরণ') থেকে জানা যায় তিনি দারাশিকোর সময়ে তাঁর সভায় সভাপণ্ডিত ছিলেন। এবং তাঁর রচিত 'ভামিনী বিলাস' কাব্যের অন্তিমে উল্লেখিত হ'য়েছে—"দিল্লী বল্লভ-পাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ"—অর্থাৎ দিল্লীবল্লভ পাণিপল্লবতলে (জীবনের শ্রেষ্ঠকাল) যৌবন অতিবাহিত করেছেন (সেখানে)। 'দিল্লী-বল্লভ' দারাশিকো ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রচিত কাব্যশাস্ত্র 'রসগঙ্গাধর'। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে 'রসগঙ্গাধর' নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী সংযোজন। তাঁর ভাষ্য মতে কাব্যের সংজ্ঞার্থ : "রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক: শব্দ : কাব্যম্।"— 'রসগঙ্গাধর, ১/১।- অর্থাৎ যে শব্দ রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক, তা-ই কাব্য। 'রমণীয়' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, -- যা লোকোত্তর অর্থাৎ কেবলমাত্র সংবেদনশীল কাব্যনির্মাতার এবং সহৃদয় পাঠকের নিজস্ব অনুভবসিদ্ধ আনন্দের জনকস্বরূপ (চমৎকৃতিময়) জ্ঞানের গোচর (বিষয়ীভূত)। 'লোকোত্তরাহ্লাদজনক জ্ঞানগোচরতা' রূপ 'রমণীয়তা'ময় অর্থের (বিষয়ের) প্রতিপাদন তাবৎ সুকুমার কলারই (art) লক্ষ্য। এখানে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের 'শব্দঃ' পদটি প্রয়োগ গভীর তাৎপর্যবহ (কাব্যৈকলক্ষ্য করতে)। মনে হয় পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের প্রদত্ত কাব্য-সংজ্ঞার্থটি তুলনামূলকবিচারে অনেকবেশী আধুনিক এবং

পরিপূর্ণতার স্বাক্ষরবাহী। এবং এ-সংজ্ঞার্থের আলোকে সাম্প্রতিক কালের কাব্য-সাহিত্যেরও আংশিক বিচার সম্ভব।

আপাতদৃষ্টিতে 'রসগঙ্গাধর' প্রণেতা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথকে ধ্বনি-বাদী ব'লে মনে হয় কিন্তু গভীর অভিনিবেশসহকারে পর্যবেক্ষণ করলে এ সত্য ভাস্বর হয়ে ওঠে যে, তিনি রসবাদ, ধ্বনিবাদ, বক্রোক্তিবাদ অর্থাৎ তাঁর পূর্বসূরীদের তাবৎ মতবাদকে সাঙ্গীকৃত করে তার সারাৎসারে নির্মাণ করেছেন নিজস্ব কাব্য-সংজ্ঞার্থটিকে।

কাব্যতত্ত্বে জগন্নাথ পূর্বাচার্যদের সিদ্ধান্তসমূহকে শ্রদ্ধাসহকারে সরিয়ে রাখেন নি, কিংবা নির্বিচার আনুগত্যও জানান নি; বস্তুত একজন তীক্ষ্ণধী নৈয়ায়িকের সূক্ষ্ম-বিচারবোধে প্রাক্তনকে গ্রহণ অথবা বর্জন করেছেন। আচার্য দণ্ডী মনীষী ভরতের 'দশগুণ' কে গ্রহণ করেছিলেন। বামন তার সঙ্গে সংযোজিত করলেন, 'দশঅর্থগুণ' এবং ভামহের গ্রন্থে 'মাধুর্য্য' 'ওজঃ' 'প্রসাদ' ত্রয়ীর নাম উল্লেখিত হলেও এরা 'গুণ'-এর মর্যাদা পায় নি। অতএব 'ধ্বন্যালোকে' ভামহে কিংবা মম্মটভট্টে যেখানে একই পথের অনুসরণ, সেখানে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সে মতের অসারত্ব প্রমাণ করে, যৌক্তিক বিধানে আচার্য দণ্ডী ও বামনের মতকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করলেন অনুপম বিশ্লেষণের ভিত্তিতে।

শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি, এবং সমাধি—পূর্বাচার্যদের প্রদত্ত এ-দশগুণের নাম তিনি গ্রহণ করেছেন ঠিকই কিন্তু এগুলোর লক্ষণ নির্দেশে তিনি অবলম্বন করেছেন একান্ত নিজস্ব পথ। ("নামানি পুনঃ তানি এব, লক্ষণং তু ভিন্নম্")। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রীতিকেও সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানান নি তাঁর গ্রন্থে। 'রসগঙ্গাধরে' তিনি বৈদর্ভী ইত্যাদির রীতির আলোচনা করেছেন মনোরম উদাহরণ সংযোগে।

বস্তুত জগন্নাথ তাঁর 'রসগঙ্গাধরে' সার্থকভাবে সাঙ্গীকৃত করেছেন পূর্ব-প্রচলিত তাবৎ মতবাদকে। তাই তাঁর কাব্যবিচারে রস, ধ্বনি, রীতি ও বক্রোক্তিবাদের সমন্বিত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক বোধির দীপ্র প্রভাবে 'রসগঙ্গাধর' এক উজ্জ্বল সংযোজন।

অষ্টাদশ শতাব্দের পর থেকে অদ্যাবধি প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের অনুসারী আলোচনা অনেকটা কমে এসেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং কাব্যতত্ত্বের (বিশেষত ইংরেজী) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব আলোচনায় নতুন বাঁক সূচিত হয়েছে।

প্রধান মতবাদ

অলঙ্কারবাদ, রীতিবাদ, বক্রোক্তি ও ধ্বনি-রসবাদ

প্রাচ্য কাব্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে কাব্য কি এবং সে-কাব্যের আত্মা কা'কে বলা যায় এ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বির্তক বর্তমান। কাব্যের উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য কি সে-বিষয়ে তাঁদের মধ্যে তেমন কোনো বাক্‌বিতণ্ডা নেই, কিন্তু কিভাবে বা কোন পথে সে উদ্দেশ্যে পৌছানো যায় তা নিয়ে কলহের অন্ত নেই। পণ্ডিত সমাজের দীর্ঘকালিক এ বিতর্ক নিয়ে ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের পাঠকমাত্র বিভ্রান্ত, ছাত্র-ছাত্রীরা আতঙ্কিত এবং শিক্ষক-সমালোচক গলদঘর্ম। একে কাব্য ব্যাপারটিই সাধারণ শিক্ষিত মানুষের কাছে কিছুটা দুর্জ্ঞেয়, [কারণ, প্রাচ্য পণ্ডিতদের মতে, কবি তাঁর 'অপূর্ববস্তু-নির্মাণ-ক্ষম প্রজ্ঞা' (ধ্বন্যালোক, টীকা ১/৬) (প্রতিভা) বলে সহৃদয় সামাজিক হৃদয়ে শব্দার্থের সাহায্যে যে লোকোত্তর আনন্দ দান করেন, তাই কাব্য।] তারপর আবার সে কাব্যের (মম্মটভট্টের মতে, যা স্রষ্টার সৃষ্টি অপেক্ষা সুন্দরতর) আত্মা—এতো নিঃসন্দেহে জটিলতম বিষয়। আমরা এখানে প্রাচীন পণ্ডিতদের মতামতের চুলচেরা বিশ্লেষণে না গিয়ে খুব সহজ এবং সংক্ষিপ্তভাবে তাঁদের এ বিষয়ক বক্তব্যের সারাৎসার তুলে ধরতে প্রয়াস পাবো। কাব্য কি এবং কাব্যের আত্মা বলতে তাঁরা কি বুঝিয়েছেন সেটা জানা দরকার।

ভারতীয় দর্শনের ভাষ্য অনুসারে আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ হচ্ছে; সত্তা (সৎ), চৈতন্য (চিৎ) এবং আনন্দ-মাত্র অর্থাৎ 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'। এ তিনই এক, অবিচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছেদ্য, কেবল উপলব্ধির সুবিধার্থে তিনটি শব্দের প্রয়োগ হ'য়ে থাকে। এবং চিত্ত শব্দ দিয়ে সে অন্তঃকরণকে বুঝানো হয়, যে-অন্তকরণ হৃদয়-মন-বুদ্ধি-অহংকার প্রভৃতির সমবায়ে সৃষ্ট। চিত্তের মাধ্যমে আত্মা সমস্ত কিছুকে ভোগ করে অর্থাৎ চিত্তের আশ্রয়ে আত্মা যেমন অন্তর্জগতকে সরাসরি উপলব্ধি করে, ভোগ করে, তেমনি এরই সাহায্যে বহির্জগতের স্থাবর-অস্থাবর জঙ্গম-জড়, পশু পাখী-মনুষ্য-কীট-পতঙ্গের জগৎ, নিসর্গপ্রকৃতি তাবৎ বস্তু তার ভোগের সামগ্রী হ'য়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় দর্শনে কথিত এ-আত্মাই শুদ্ধ 'আমি' শব্দের লক্ষ্য। 'আমি'র (অহম্) সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। এবং আমি বা আত্মা যেহেতু অন্তর্জগত ও বহির্জগতের লক্ষ্যবস্তু, সেজন্যেই 'আমি' র আমাতেই সমস্ত জগৎসংসার বিধৃত সত্তাবান এবং প্রকাশমানও বটে। চিত্ত বা অন্তঃকরণের সাহায্যে আমরা আমি বা আত্মাকে বিশ্বময় ব্যক্ত বা ব্যাপ্ত ক'রে থাকি।

ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত এ আত্মাতে তিনটি গুণ বর্তমান: সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ। সত্ত্বগুণের কারণে অন্তঃকরণ বা চিত্ত সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করে, জানে, বিতর্কবিচার করে, আস্বাদন করে, আহ্লাদিত হয় এবং প্রকাশে-প্রচারে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। এবং প্রকাশের সরণীতে আত্মা (চিত্তের আশ্রয়ে) যেন বিচিত্র বিকাশে দীপ্র হ'য়ে ওঠে। প্রকাশ ও আনন্দ তাই সত্ত্বগুণান্বিত চিত্তের প্রধান ধর্ম।

চিত্তের অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য রজোগুণের মৌল বৈশিষ্ট্য, এখানে চিত্ত আনন্দিত প্রকাশের অন্তরায় এবং বিকার (বিক্ষেপ) সৃষ্টির হেতু। আর তমোগুণে চিত্ত থাকে স্থির, গতিহীন, জড় স্তম্ভিত। এতে আত্মার নিশ্চল, বিমূঢ় অবস্থার কারণে একটা মোহের আবরণ বা আচ্ছাদন

সৃষ্টি হয়। এবং চিত্তের এ মূঢ়াবস্থা যেমন আনন্দ ও প্রকাশ-বিরোধী তেমনি বিকার বিক্ষেপেরও (রজোগুণের)। অর্থাৎ তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণের বিপরীতধর্মী।

ফলে ভারতীয় দর্শনের বিচারে রজোগুণের বিকার বিক্ষেপ এবং তমোগুণের নিষ্ক্রিয় জড়তার আচ্ছাদনে মানুষের মধ্যে যে আমি বা আত্মা তার প্রকাশ হয় বাধাগ্রস্ত। এবং যখন চিত্তে এ দু'গুণের প্রবল প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় তখন ধূলিমাখা কাচের মতো সত্ত্বগুণও অনেকটা আচ্ছাদিত, নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে। এ অবস্থায় চিত্তে থাকে না কোনো সুখানুভূতি বা প্রকাশের কোনো ব্যাকুলতা। মানুষের চিত্তের এ সীমাহীন দুর্গতি থেকে আমি বা আত্মা মুক্তি পেতে চায়, তাই সে অতৃপ্ত আমি যাত্রা করে বিরাটের সন্ধানে, পূর্ণের লক্ষ্যে—উদ্দেশ্য, প্রকাশ ও আনন্দ। আর তখন সে আমির কাছে "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭/২৩/১) অল্পে সুখ নেই, যা ভূমা (বিরাট) তা-ই সুখ। এবং আনন্দই আত্মার শুদ্ধ রূপ, আনন্দই ব্রহ্ম (আনন্দো ব্রহ্মেতি)।

কাব্যসাহিত্য যেহেতু প্রকাশধর্মী সেজন্যে প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রীরা সত্ত্বগুণময় চিত্তকেই কাব্য-কলার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে তাঁদের বিবৃত 'কাব্যাত্মা' প্রকাশ ও আনন্দ সম্পর্কিত অবশ্যই। এবারে আমাদের বিচার্য, তাঁদের বিতর্ক-বিষয়, কাব্যতত্ত্বে যাঁরা অলঙ্কার-বাদী হিসেবে আখ্যায়িত, তাঁরা বলেন,— কাব্যে সার্থক অলঙ্কার প্রয়োগে লোকোত্তর আবেদন সৃষ্টি হয় এবং পাঠক ঈপ্সিত আনন্দের সন্ধান পায়। যাঁরা রীতিবাদী, তাঁদের বক্তব্যের সার হচ্ছে : যথেচ্ছ অলঙ্কার প্রয়োগে কাব্য সার্থক কাব্য হয় না, অলঙ্কার তো কাব্যের অস্থির বা অনিত্য-ধর্ম, বাইরের জিনিস। সুতরাং কাব্য-কথাকে অলঙ্কৃত করলেই সে কাব্য অলৌকিক আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয় না, কাব্যের মূল ব্যাপার

হচ্ছে কথাকে সুন্দর ক'রে বিচিত্র উপায়ে ব্যক্ত করা (বিশিষ্ট পদ-রচনায়) এবং নির্মাণ কৌশলের এ অনুপম মুন্সীয়ানায় কাব্য হয়ে উঠবে, সহৃদয় জন আকাঙ্ক্ষিত আনন্দের সন্ধান পাবেন।

বক্র-উক্তিকে যিনি কাব্যের জীবন ব'লেছেন, তাঁর মতে অলঙ্কার, রীতি. ধ্বনি, রস সবই বক্রোক্তির অন্তর্ভুক্ত, এর কোনোটিই আলাদাভাবে কাব্যের আত্মা হতে পারে না, অতএব বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ।

ধ্বনিবাদীরা বললেন 'ইহ বাহ্য', অলঙ্কার রীতি কিছুই কাব্যের আত্মা নয়, আত্মা অত হাল্কা জিনিস নয়, আত্মা অনেক গভীরের ব্যাপার, বাইরের সাজ-সজ্জায় কিংবা লোক দেখানো ঢঙে তার হদিস পাওয়া যাবে না, অলঙ্কার বা রীতিতে আত্মা ব্যঞ্জিত হয় না, হ'তে পারে না। কাব্যের আত্মা হচ্ছে ধ্বনি, যা কাব্যের শব্দার্থের অতিরিক্তি কিছু। এ "ভিন্ন কিছু" ভিন্ন কাব্য কাব্যই হয় না। অর্থাৎ তাঁদের কথায় কাব্যের বাচ্যার্থের অতিরিক্ত যে প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গার্থ তাই ধ্বনি এবং ধ্বনি ('ভিন্ন কিছু') ব্যতিরেকে কাব্যের সার্থকতা অসম্ভব। এ ধ্বনি কিসের ধ্বনি, এর উদ্দেশ্যই বা কি ?

এ ধ্বনি রসের ধ্বনি, আর এর উদ্দেশ্য রসাস্বাদের আনন্দ প্রাপ্তি। ফলে রসবাদীরা বলেন, কাব্যের চরম লক্ষ্য যেহেতু রস, অতএব রসই কাব্যের আত্মা।

অলঙ্কারবাদ ঃ বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে একটি মেয়েলী প্রবাদ প্রচলিত আছে, "সাজালে গোছালে (গোজালে) বান্দরীও (বানরী) সুন্দরী হয়।" (ফরিদপুর যশোরের মেয়েলী-প্রবাদ) এ প্রবাদের তাৎপর্য হ'চ্ছে বানরী দেখতে মোটেই সুন্দর নয়, মুখ পোড়া, চোখ দু'টো ক্ষুদ্র, ভ্রূর লোম অস্বাভাবিক রকম বড়, দৃষ্টি তীর্যক, লোমাবৃত সারা শরীর, হাত, ভয়ঙ্কর নখ, দাঁত ইত্যাদি, এহেন প্রাণীকেও সুন্দর ক'রে সাজালে একটা শোভা সৃষ্টি হয়, কুরূপা বানরীও কিছুটা সুন্দরী হ'য়ে ওঠে। ঠিক তেমনি যে

রমণী আদৌ রমণীয় নয়, তাকেও লোচন-রোচন অলঙ্কারে বিভূষিতা ক'রলে তার শোভাও বৃদ্ধি পায়, সে অতি-সাধারণ মেয়েও মুহূর্তে অসাধারণ হ'য়ে ওঠে, অলঙ্কারের বদৌলতে। আভরণের আভায় সেও সুন্দরী ব'লে বিবেচিত হয়। ঠিক একইভাবে কাব্যের দেহকে কিংবা মুখের কথাকে যদি সাজিয়ে গুছিয়ে অর্থাৎ শোভাবর্ধক অলঙ্কারে সজ্জিত করা যায়, তবে, সে বহু-ব্যবহৃত কথাতে, আটপৌরে সাদামাটা কাব্যদেহে আলাদা দ্যোতনা আসে, সে কথা বা বাক্য মনোহর হ'য়ে ওঠে। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের সেই রাজপুত্র, যে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছে রাজকন্যার কাছে। এবং প্রাণপ্রিয়া রাজকন্যাকে সাজাতে "ঘুম থেকে উঠেই সোনা যদি নাও জোটে, অন্তত চাঁপাকুঁড়ির সন্ধানে তাকে বেরুতেই হবে।" এরপরেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, "এর থেকেই বোঝা যাবে, সাহিত্যতত্ত্বকে অলঙ্কারশাস্ত্র কেন বলা হয়।. . .অলম্ অর্থাৎ বাস্, আর কাজ নেই। এই অলঙ্কৃত বাক্যই হ'চ্ছে রসাত্মক বাক্য।" অন্য প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের মন্তব্য বিরল নয়,. . .এই কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর ক'রে, মা যেমন ক'রে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসরঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়। যা অত্যন্ত অনুভব করি, সেটা যে অবহেলার জিনিস নয়, এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।"

কাব্যবিচারে যাঁরা দেহাত্মবাদী তাঁদের বক্তব্য : শব্দার্থ যেহেতু কাব্যের শরীর, অতএব বাক্যের শব্দকে অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমকাদি অলঙ্কারে এবং অর্থকে উপমা উৎপ্রেক্ষা, রূপকাদি অলঙ্কারে সুন্দর ক'রে তুললেই তা কাব্য পাঠকের কাছে উপাদেয় হ'য়ে উঠবে এবং লোকোত্তর আনন্দ সৃষ্টি হবে যুগপৎ।

ষষ্ঠ শতাব্দের আচার্য দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, "কাব্যশোভাকরান্ ধর্ম্মান্ অলঙ্কারান্ প্রক্ষেতে।"—কাব্যাদর্শ।

অর্থাৎ, অলঙ্কার কাব্যের সৌন্দর্যবিধায়ক ধর্ম। তিনি কাব্যবিচারে অলঙ্কার প্রস্থানের সমর্থক হিসেবে সুবিদিত। ভরত ব্যাখ্যাত রসকেও তিনি অলঙ্কার বলে গণ্য ক'রেছেন। কাব্যাদর্শে কাব্যের গুণ ও ধর্ম সম্পর্কে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা দিয়ে অবশেষে এ মীমাংসায় পৌঁছেছেন যে, অলঙ্কারই কাব্যের শোভাবৃদ্ধির সহায়ক। এবং "সেই অলঙ্কৃত অভীষ্ট অর্থ সংবলিত পদাবলীই কাব্য।" অলঙ্কারবাদীদের সপক্ষে সংস্কৃতপুরাণে সুন্দর একটি উক্তি আছে, "অর্থালঙ্কার রহিতা বিধবের সরস্বতী"— অগ্নিপুরাণ। অর্থাৎ অর্থালঙ্কার ব্যতিরেকে স্বয়ং বাগ্‌দেবী সরস্বতীও বিধবাসদৃশা।

সপ্তম শতাব্দের বিখ্যাত অলঙ্কারশাস্ত্রী আচার্য ভামহকে অনেকে অলঙ্কার প্রস্থানের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি তাঁর কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে শব্দ ও অর্থের (সার্থক) মিলনকেই কাব্য বলেছেন ("শব্দার্থৌসহিতৌ কাব্যম্") এবং তাঁর প্রদত্ত এ কাব্য সংজ্ঞার্থেই (শব্দার্থ-ময় বাক্যই কাব্য) অলঙ্কারের অম্লান প্রাধান্য ঘোষিত। তিনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) বর্ণিত নাট্যরসের প্রয়োগ সম্পর্কেও সম্ভবত প্রতিকূল ধারণা পোষণ করতেন। কারণ, ভামহর বিচারে রস ও অল-ঙ্কার হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিৎ। তাঁর মতে অলঙ্কারের, সুনিপুণ প্রয়োগেই কাব্যের কাব্যত্ব। কাব্যালঙ্কারে একটি সুন্দর দৃষ্টান্তসহযোগে তিনি তাঁর এ বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন,—

"রূপকাদিবলঙ্কারস্তস্যান্যৈর্বহু ধোদিতা ঃ।
ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বণিতামুখম্।।"— কাব্যালঙ্কার

রূপকাদি অলঙ্কার অন্যের দ্বারা বিচিত্র (বহু) ভাবে বর্ণিত, প্রেয়সীর মুখ স্বভাবসুন্দর (কান্ত) হ'লেও অলঙ্কার ব্যতীত তার সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না। অতএব ভামহের বিবেচনায় : অলঙ্কার্যই কাব্য এবং কাব্যের কাব্যত্ব একমাত্র অলঙ্কার সংযোগেই সৃষ্ট হয়। অতুলচন্দ্র গুপ্ত ধ্বনিরসবাদের

গভীর সমর্থক হ'য়েও অলঙ্কারবাদীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছন "এবং যেমন অধিকাংশ লোক-মতে না হ'লেও জীবনে লোকায়ত মতের অনুবর্তী, দেহ ছাড়া যে মানুষের আর কিছু আছে, তাদের জীবন-যাত্রা তার কোন প্রমাণ দেয় না, তেমনি মুখের মতামত ছেড়ে যদি অন্তরের কথা ধরা যায়, তবে দেখা যাবে অধিকাংশ কাব্যপাঠক কাব্য-বিচারে এই দেহাত্মবাদী। তাদের কাব্যের আস্বাদন শব্দ ও অর্থের অলঙ্কারের আস্বাদন।" কাব্যজিজ্ঞাসা,

রীতিবাদ ঃ কাব্যবিচারে পরবর্তীকালে অলঙ্কারবাদীদের মতামত প্রাধান্য পেল না। কারণ বহু কাব্যতাত্ত্বিক প্রজ্ঞাপূর্ণ যক্তিসহযোগে প্রমাণ করেছেন যে অলঙ্কৃত বাক্যই কাব্য হয় না। এ প্রসঙ্গে এমন রসোত্তীর্ণ কবিতা বা কাব্যের নাম করা যাবে. যেখানে তথাকথিত অলঙ্কারের — অস্তিত্বই অবর্তমান। অতএব অলঙ্কারবাদীদের বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোযে দুষ্ট।

আচার্য বামন (অষ্টম শতাব্দের শেষভাগ হ'তে নবম শতাব্দের প্রথম ভাগ) এ মতের বিরোধিতা ক'রে বললেন, "কাব্যং গ্রাহ্যম্ অল-ঙ্কারাৎ" অর্থাৎ কাব্য অলঙ্কার দ্বারাই গ্রাহ্য হয় বটে, কিন্তু এ অলঙ্কার তো বাইরের অনুপ্রাস উপমাদি অলঙ্কার নয়। তাই পরবর্তী সূত্রেই বিবৃত করলেন,—"সৌন্দর্যম্ অলঙ্কার" সৌন্দর্যই অলঙ্কার। এবং এ সৌন্দর্যই কাব্যের অঙ্গীভূত রূপলাবণ্য; বহিরঙ্গের অনুপ্রাস উপমাদি এ সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে মাত্র। তিনি কাব্যবিচারে গুণ (মাধুর্যাদি)-কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন এটাই (গুণ) কাব্যের নিত্যধর্ম এবং অলঙ্কার কাব্যের' অস্থির বা অনিত্যধর্ম। এ 'গুণ' (যা রমণীদেহের লাবণ্যের সঙ্গে তুল্য) পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গীকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত হয়। তাই তাঁর বক্তব্যের সারাৎসার হচ্ছে—গুণাত্মক পদরচনার বিশিষ্ট

রীতিই কাব্যের আত্মা। ["রীতিআত্মা কাব্যস্য" রীতি মানে "বিশিষ্ট পদরচানারীতিঃ।' পদরচনার আত্মা হ'লো 'গুণ' "বিশেষোগুণাত্মা"]

প্রাচ্যকাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে রীতিবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে বামনের নাম স্বীকৃত। আচার্য বামনের এ কাব্য-মতাদর্শে কিছুটা সত্য অবশ্যই বর্তমান কারণ, "অঙ্গে অলঙ্কার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখায় না, যদি না তার অবয়ব সংস্থান নির্দোষ হয়। 'স্টাইল' হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়ব সংস্থান।" রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "স্টাইল হোলো মুখশ্রী।"

কাব্য-নির্মাণে স্টাইল বা রীতি যে গৌণ নয় তার প্রমাণ পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যে বর্তমান। সংস্কৃত, বাঙলা বা ইংরেজী সাহিত্যে এমন অনেক কবি আছেন, যারা কেবল রীতি বা স্টাইলের কারণে কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবি বিদ্যাপতি কিংবা রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্রের কবিখ্যাতির মুখ্য কারণ স্টাইল বা রীতি। গদ্য সাহিত্যের প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু কিংবা হাল আমলের কমলকুমার মজুমদারের প্রধান মুন্সীয়ানা তো বিশিষ্ট পদ-রচনা কৌশলে বা রীতিতে।

'রাজতরঙ্গিণী' অনুসারে কাশ্মীর রাজ জয়াপীড়ের অন্যতম সভা-কবি ছিলেন মনোরথ (জয়াপীড়ের রাজত্বকাল, ৭৭৯-৮১৩ খ্রীস্টাব্দ), পণ্ডিতেরা তাঁকে রীতিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। ধ্বন্যালোকের বৃত্তিতে আনন্দবর্ধন তাঁর একটি বিদ্রূপাত্মক (ধ্বনিবাদ বিরোধী) কবিতা উদ্ধৃত ক'রেছেন, তাতে কবি মনোরথ সুস্পষ্টভাবে বিদ্রূপ করেছেন ধ্বনিবাদীদের; আমরা এখানে সে মূল কবিতাংশ উদ্ধৃত না ক'রে শ্যামা-পদ চক্রবর্তীর আক্ষরিক অনুবাদটি তুলে দিচ্ছি:

"রসময় সালঙ্কার বস্তু কিছু নাই যার মাঝে,
নাহি শুদ্ধা পদাবলী, নাহি বক্র-বাচন-ভঙ্গিমা,

ধ্বনি কাব্য বলি তার জড়বুদ্ধি করে স্তুতিবাদ
প্রীতি ভরে গদ গদ ; সুমতি শুধায় যদি তারে
ধ্বনি, কারে বলে, বন্ধু ? জানি না সে কি দিবে উত্তর।"
—অলঙ্কার-চন্দ্রিকা

এখানে মনোরথ স্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছেন যে, যার (যে কাব্য বা কবিতার) মধ্যে রসময় জিনিস ব'লে কিছু নেই, যার কবিতায় নেই চতুর বচনবিন্যাস (বক্রবাচন ভঙ্গিমা) শব্দার্থ নয় অলঙ্কৃত, তাকে আনন্দে গদ গদ হয়ে (প্রীতিভরে ফ্যাশনের খাতিরে) ধ্বনি-কাব্য বলে প্রশংসা করে কেবল জড়বুদ্ধির লোকেরা নিতান্ত গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে, সুধীজনের কাছে ধ্বনির স্বরূপ কেউ ব্যাখ্যা করতে পেরেছে, এমন কথা তো কারো জানা নেই।

বক্রোক্তিবাদ : কাব্যতত্ত্বে রীতিবাদের প্রবক্তা হিসেবে আচার্য বামনের নাম যেমন সুপরিচিত, তেমনি বক্রোক্তিবাদের প্রবর্তকরূপে এককভাবে কুন্তকের নামই স্মর্তব্য। কাশ্মীরবাসী এ পণ্ডিত প্রসিদ্ধ 'বক্রোক্তিজীবিত' (১০ম থেকে ১১শ শতাব্দের প্রথম পাদে) গ্রন্থের প্রণেতারূপে। তাঁর মতে, ''বক্রোক্তি কাব্যজীবিতম্'' বক্রোক্তিই কাব্যের জীবন বা আত্মা। (তিনি প্রস্তাবনাতেই নিজের পার্থক্য সূচিত করলেন, অলঙ্কার শাস্ত্রে বহুব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ "আত্মার" পরিবর্তে "জীবন" ব'লে।) সে যাহোক, তাঁকে অনেকেই রীতিবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করলেও, প্রাচ্য কাব্যতত্ত্বে রীতি বলতে যা বোঝায়, তিনি আদৌ সে সঙ্কীর্ণ রীতির সমর্থক ছিলেন না। বামন-কথিত রীতিতে তাঁর কোনো প্রতীতিও ছিলো না, কারণ সে সময়, এদেশে অঞ্চলভেদে (যথা, বৈদর্ভী, গৌড়ী, আবন্তিকী পাঞ্চালী, মাগধী, লাটিয়া (কা) প্রভৃতি রীতি প্রচলিত ছিলো। বিশেষ অঞ্চলের কবিরা বিশেষ রীতিতে কাব্য নির্মাণ করতেন, এটি ছিলো এক একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাব্যরচনার

বিশিষ্ট পদ্ধতি বাক্যে (কাব্যদেহে) অবয়ব সংস্থানের এ বিশেষ ঢংকেই, বামন প্রমুখ পণ্ডিতেরা রীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং আচার্য বামনের মতে 'বৈদর্ভী' শ্রেষ্ঠতম রীতি।

কিন্তু রীতি সম্পর্কে কুন্তকের বক্তব্য একান্তভাবে ভিন্নধর্মী। তাঁর মতে কোনো বিশেষ অঞ্চলের সঙ্কীর্ণ সীমাতে রীতি সীমাবদ্ধ নয়, এটা নয় কেবল শব্দ ও অর্থের সমবায়ে গঠিত কোনো পদরচনা কৌশল, রীতি মূলত প্রত্যেক কবি বা কাব্য নির্মাতার স্বভাবজাত। সুতরাং প্রাগুক্ত রীতি কাব্যের প্রাণ বা আত্মা হ'তে পারে না। তাঁর মতে তাবৎ অলঙ্কারই বক্রোক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং সে অলঙ্কারের প্রধান উদ্দেশ্য বৈচিত্র্য উৎপাদন, 'বৈচিত্র্য সিদ্ধয়ে'।

"লোকোত্তর চমৎকারকারি বৈচিত্র্য সিদ্ধয়ে।
কাব্যসায়মলঙ্কারঃ বোহপ্যপুর্বো বিধায়তে॥" (বক্রোক্তিজীবিত)

অর্থাৎ লোকোত্তর চমৎকারই বৈচিত্র্য সিদ্ধির জন্যে (অসামান্য আনন্দ বিধায়ক বৈচিত্র্য সৃষ্টির হেতু) কাব্যের অপূর্ব অলঙ্কারই অলঙ্কার। এবং ষষ্ঠ শ্লোকে যখন তিনি বলেন 'সালঙ্কারস্য কাব্যতা'। ('কাব্যেস্য সালঙ্কারতা' না বলে) তখন এ সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হয় যে কুন্তক বিশ্বাস করতেন, কাব্য সব সময়ই স্বয়মলঙ্কৃত (নিজেই শোভিত) হ'য়েই সৃষ্ট হয়। অর্থাৎ তাঁর মতে কাব্যের অলঙ্কার বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া কোনো বিশেষ আভরণ নয়, কাব্য যখন প্রকৃত কাব্য হ'য়ে ওঠে, তখন আপনা থেকে সেটা অলঙ্কৃত মনে হয় বাড়তি অলঙ্কার সংযোগ না করলেও। অতএব আরোপিত অলঙ্কার তাঁর মতে কখনোই 'কাব্যাত্মা' ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে না। এবং বক্রোক্তি ব্যাখ্যার বিশালতায় তিনি প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ (ধ্বনি)-কে চিহ্নিত করলেন এর (বক্রোক্তির) বিচিত্র অঙ্গ হিসেবে, আর ভরত ব্যাখ্যাত রস (যা পরবর্তীকালের বহু পণ্ডিতের আলোচনায় সমৃদ্ধ) সম্পর্কে বললেন

যে, রস কাব্যপ্রাণ বক্রোক্তিকেই পরিপুষ্ট-উপভোগ্য ক'রে তোলে মাত্র 'অতএব, অলঙ্কার রীতি, ধ্বনি বা রস সব কিছুই আকাঙ্ক্ষিত ফল সরবরাহে ব্যর্থ হয়।' সুতরাং এ সর্বগ্রাহী বক্রোক্তিতে যেহেতু অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনি, রস সবই বর্তমান, সেজন্যে একে কাব্যের সর্বস্ব বললে অত্যুক্তি হয় না। ১০ম শ্লোকে এ বক্রোক্তির পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

"উভাবেতাবলঙ্কার্যৌ তয়োঃ পুনরলঙ্কৃতিঃ।
বক্রোক্তরেব বৈদগ্ধভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে।।" (—প্রাগুক্ত)

এখানে শেষের পংক্তিতে কুন্তক স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, বৈদগ্ধপূর্ণ ভঙ্গিমাময় উক্তিই (বিচিত্রভাবে উক্ত কবিকর্ম) বক্রোক্তি। আচার্য মহিমভট্ট কুন্তকের এ বক্রোক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এভাবে,—

"প্রসিদ্ধং মার্গমুৎসৃজ্য যত্র বৈচিত্র্যসিদ্ধয়ে।
অন্য থৈবোচ্যতে সোহর্থঃসা বক্রোক্তিরুদাহৃতা।।" (--ব্যক্তিবিবেক)

অর্থাৎ যেখানে বৈচিত্র্য উৎপাদনের (সিদ্ধির) জন্যে, স্বাভাবিক (প্রসিদ্ধ) পথ (অর্থ) পরিত্যাগ করে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা হয় (অন্য প্রকার উক্ত হয়), সে অর্থই বক্রোক্তি বলে কথিত।

কুন্তকের এ মতবাদ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এ ব্যতিক্রমী সাহসী প্রস্তাবনা যেমন অভিনব তেমনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কারণ ভরত থেকে শুরু করে অভিনব গুপ্ত এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রীরা যেখানে শব্দ, অলঙ্কার বা বিশেষ কোনো বাক্য-শ্লোক কিংবা শ্লোকার্ধের ওপর নির্ভর ক'রে কাব্যত্ব নির্ণয়ে প্রয়াসী, কাব্য-কবিতার খণ্ডাংশকে সম্বল ক'রে আত্মার-অন্বেষায় ব্রতী, কুন্তক সেখানে সমগ্র কাব্যের বক্তব্য বা সার্বিক উক্তির (সেটা অবশ্যই এক ধরনের অসহজ বক্র তো বটেই) ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি সমগ্র গ্রন্থে এ সত্য প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন যে, বক্রতা

কেবল কাব্যের বিশেষ কোনো অংশকে নির্ভর ক'রে নির্মিত হয় না, সমগ্র রচনায় (প্রবন্ধ নাটকেও) প্রকীর্ণ থাকে। কুন্তক তাঁর সর্বগ্রাহী বক্রোক্তির ব্যাখ্যায় যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন তা সাম্প্রতিক কালেরও চরম বিস্ময়ের বিষয়। আপাত দৃষ্টিতে 'বক্রোক্তি জীবিত' গ্রন্থটিকে অনেকের কাছে আরোও দু'চারটে কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের মতো মনে হ'তে পারে, কিন্তু আকৃতিগত দিক থেকে (পঙ্‌ক্তীকরণ, শ্রেণীবিভাজন পদ্ধতিতে) অন্য গ্রন্থের সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকলেও মৌল প্রকৃতিতে প্রবল পার্থক্য বর্তমান। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রীরা যেখানে চিরকালের 'সংস্কৃত' সূত্রের কষ্টিপাথরে কাব্য (শ্লোক, বাক্য) যাচাইয়ে পক্ষপাতী এবং শতবার 'নিরঙ্কুশা বৈ কবয় (কবিরা নিরঙ্কুশ) মুখে উচচারণ করলেও কোনো কাব্য-নির্মাতাই কার্যত তাঁদের কাছে নিরঙ্কুশ নন, বরঞ্চ সমালোচকের ক্ষমাহীন অঙ্কুশ কবিকূলকে সন্ত্রস্ত করেছে সর্বক্ষণ; সেখানে কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে ঐতিহ্যবাহী অলঙ্কারশাস্ত্রের অসহিষ্ণু অঙ্কুশ থেকে কবি ও কাব্যকে মুক্ত করতে আন্তরিকভাবে যত্নবান। তিনি সমগ্র গ্রন্থে কখনো স্পষ্ট-ভাবে কখনো অস্পষ্টভাবে (বক্রভাবে) কবির সার্বভৌম শক্তিকেই সানন্দ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁকে ব্যতিক্রমী কাব্যতাত্ত্বিক বলা যায় এ জন্যে যে, তিনি নিজে একজন অলঙ্কারশাস্ত্রী হ'য়েও কাব্য-বিচারের যুক্তির শাস্ত্রে তথাকথিত অলঙ্কারের প্রথাপীড়িত বন্ধন থেকে কাব্য এবং কাব্য-নির্মাতা কবিকে অব্যাহতি দানে আগ্রহী ছিলেন অকুণ্ঠভাবে। কালাতিক্রমী প্রজ্ঞার অধিকারী এ অসামান্য পণ্ডিত এ সত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে,— "কাব্যের প্রকৃত সিদ্ধি কথায়, রচনায় বা উক্তিতে।" কারণ উক্তি বা প্রকাশের ওপরই কাব্যের সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। ফলে সে উক্তি যদি অসাধা-রণ বক্রোক্তি (এখানে বক্রোক্তি অলঙ্কারের শ্লেষ বা কাকুবক্রোক্তি

নয়) না হয় তবে কাব্যও কোনোমতেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হয় না। এবং তাঁর ভাষ্য অনুসারে যুগে যুগে কবিগণ তাঁদের কবি-শক্তি বলে কাব্যের উক্তিতে (শব্দ, বাক্য, অলঙ্কার সর্বত্র) বিপর্যয় সৃষ্টি করেন বৈচিত্র্য সৃষ্টির নিমিত্ত, নবতর প্রকাশকে স্বাগত জানানোর জন্যে। (—"এবং শব্দার্থয়োঃ প্রসিদ্ধস্বরূপাতিরিক্তমন্যদেব রূপান্তরমমভিধায় ন তাবন্মাত্রমেব কাব্যোপযোগী, কিন্তু বৈচিত্র্যান্তর বিশিষ্টমিতি) এবং তিনি কাব্য নির্মাণে অভিনবত্বের পক্ষপাতী ছিলেন বলেই প্রচলিত সূত্রে নিজেকে কোথাও সমর্পণ করেন নি। উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসহযোগে বুদ্ধিদীপ্ত বচনবিন্যাসে তিনি প্রমাণ করেছেন অলঙ্কারবাদীদের স্ববিরোধিতাকে, ধ্বনিবাদীদের অকারণ অনুমান-নির্ভরশীলতাকে। "স্বভাবোক্তি অলঙ্কার" নামেই প্রমাণিত এটা আদৌ অলঙ্কার নয়, অথচ অলঙ্কারবাদীরা ঢাকঢোল পিটিয়ে একে অলঙ্কার হিসেবে প্রচার করেন, এ যেন অলঙ্কারহীনতাকে অলঙ্কার বলা, নগ্নতাকে আবরণ বলে আখ্যায়িত করা এবং উলঙ্গ দেবতাকে দিগম্বর বলার সামিল। ধ্বনি বা রসবাদীরাও এ ব্যাপারে কম যান না, তাঁরা যখন সার্থক কোনো কাব্য-কবিতায় তাঁদের ফরমায়েশী ধ্বনি বা রসের প্রমাণে ব্যর্থ হন অথচ কাব্য-হিসেবে নাকচ করতে পারেন না (হয়তো প্রবল পাঠক মতে) তখন মহান প্রাজ্ঞের মতো মস্তক সঞ্চালন ক'রে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন সাধারণ বোধের কিংবা বাহ্যশ্রুতির সাহায্যে এখানে ধ্বনিরসের পরিচয় লাভ অসম্ভব, গভীরতর বোধির বা প্রগাঢ় উপলব্ধি অনুমানের সাহায্যে এসব ক্ষেত্রে ধ্বনি বা রস-প্রতীতি লাভ করতে হবে।

আসলে অলঙ্কার ও রসবাদী পণ্ডিতেরা এ স্ববিরোধের শিকার হ'তেন না যদি কুন্তকের মতো এ সত্য উপলব্ধিতে সাহসী হ'তেন যে, কাব্যকে সামগ্রিকভাবে (একটি ইউনিট হিসেবে) বিচার করা বাঞ্ছনীয়, কারণ কোনো একটি বাক্য, বাক্যাংশ, শ্লোক বা শ্লোকার্ধ

ধরে কাব্যবিচারে অগ্রসর হলে পৃথিবীর কোনো শ্রেষ্ঠ কবির সার্থকতম সৃষ্টিতেও সর্বত্র অসাধারণত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়র কিংবা মিলটনের মতো অসাধারণ কবিদের ক্ষেত্রেও এ মন্তব্য সমান সত্য। এবং হাল আমলের কবি-কর্মে এটি আরো গভীরভাবে সত্য। শেক্সপীয়রের "Etu, Brute?" কালিদাসের 'কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা। বঙ্কিমচন্দ্রের "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?" রবীন্দ্রনাথের "এত রক্ত কেন" এবং সুকান্তের "অবশ্য খাবার খেতে নয়, খাবার হিসেবে" এগুলো বিচ্ছিন্নভাবে অনলঙ্কৃত, স্বভাবোক্তি বা একান্ত সাধারণ উক্তি এর ধ্বনি বা রস আবিষ্কারের চেষ্টাও বোধকরি পণ্ডশ্রম, কিন্তু 'Etu, Brute' যখন জুলিয়াস সীজার বিশেষ মুহূর্তে অন্তিম উচ্চারণের রূপ নেয়, তখন তা অবশ্যই অসাধারণ উক্তি (কুন্তকের ভাষায় বক্রোক্তি), তেমনি শকুন্তলা নাটকে, কপালকুণ্ডলা, রাজর্ষি উপন্যাসে এবং ছাড়পত্র কাব্যের (একটি মোরগের কাহিনী) সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতে এ সমস্ত উক্তিই অসাধারণ ব্যঞ্জনা-দ্যোতক রসোক্তি, কুন্তকের কথায় ' সহৃদয়াহ্লাদকারি স্বস্পন্দ-সুন্দরঃ'' বক্রোক্তি। (বক্রোক্তিজীবিত, ১/৯) অর্থাৎ কাব্যের অর্থ সহৃদয় হৃদয়ের আহ্লাদ জন্মায় এবং স্ব-ভাবেই সুন্দর হয়ে থাকে।

এখানে কুন্তক "স্বস্পন্দসুন্দর" ব'লতে কবিকর্মের সার্বিক প্রেক্ষা-পটের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে প্রতিটি অংশের স্বচ্ছন্দ অর্থগৌরবকে বুঝিয়ে-ছেন। এবং তিনি বলেন :

> "বক্রভাবঃ প্রকরণে প্রবন্ধে বাস্তি যাদৃশঃ।
> উচ্যতে সহজাহার্যসৌকুমার্যমনোহরঃ ॥" (বক্রোক্তিজীবিত)

অর্থাৎ এর সারাৎসার হচ্ছে কোনো বিশেষ অংশে নয় সমগ্র রচনায়ই বক্রতা ব্যাপ্ত, এবং সমগ্র নাটক প্রবন্ধের মূলীভূত চারুত্ব ও মনোহা-রিত্বই বক্রভাব বা বিন্যাসবৈচিত্র্য।

ফলে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, কুন্তক কাব্যের শব্দ ও অর্থের যতোই প্রশংসা করুন না কেন, তাঁর মূল বক্তব্য থেকে কোথাও দূরে সরে যান নি। কাব্যকলায় তাঁর প্রধান প্রত্যাশা "বৈচিত্র্য', অভিনব বৈশিষ্ট্য, বিচ্ছিত্তি—এক কথায় বক্রত্ব সম্পাদন। এবং এ বক্রত্বের কারণেই কাব্য সার্থক কাব্য হয়,--'বক্রোক্তিই কাব্য-প্রাণ"।

বৈচিত্র্য আর বক্রোক্তি কুন্তকের আলোচনায় প্রায় সমার্থক শব্দ এবং অত্যধিক প্রিয়তাহেতু বারংবার উচ্চারিত। 'বক্রোক্তি জীবিত' গ্রন্থের শুরু হ'য়েছে বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ দিয়ে। এবং তিন নম্বর শ্লোকে উল্লেখিত হয়েছে কাব্যের সামগ্রিকতার ব্যাপারটি, "কাব্যবন্ধোহভিজাতানাং হৃদয়াহ্লাদকারক:" অর্থাৎ কাব্যবন্ধ (সর্গবন্ধাদি) অভিজাত সম্প্রদায়ের চিত্তের আনন্দদায়ক। এখানে 'কাব্যবন্ধ' বলতে তিনি তাবৎ সর্গবন্ধাদি বা নানা সর্গে বিভক্ত সমগ্র কাব্যকেই একটি ইউনিট ব'লে ধরেছেন এবং তা অভিজাত বর্গের আনন্দদায়ক ব'লতে বুঝিয়েছেন,— কাব্যকে যেমন অসাধারণ (অভিজাত) হ'তে হবে তেমনি কাব্যের পাঠককেও (অসাধারণ, পরিশীলিত) রুচির হ'তে হবে। কুন্তক উল্লিখিত 'বন্ধ' এখানে কাব্যে ব্যবহৃত বাক্যাবলীর গঠনবিন্যাস বা শিল্পসম্মত ফর্মের অভিধাজ্ঞাপক।

সংস্কৃত কাব্যতাত্ত্বিকদের বেশীরভাগই কবি ছিলেন না, ফলে তাঁরা কবি-অনুভূতির সামগ্রিক চমৎকারিত্বের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে কাব্যের দোষগুণগুলো ঘেঁটে বের ক'রতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন সর্বত্র। কিন্তু এ ব্যাপারে কুন্তক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধাঁচের কাব্যতাত্ত্বিক। তিনি কাব্যের প্রতিটি শ্লোকেরই চরম উৎকর্ষের প্রত্যাশী নন। কাব্যের প্রতিটি পংক্তিই যে অলঙ্কারে দীপ্র হবে কিংবা শ্লোক বা শ্লোকার্ধই যে প্রতীয়মান অর্থে গভীর তাৎপর্যময় হবে, এমন দিব্যি তিনি মানতে রাজি নন। এবং এ কারণে গোটা কাব্যকে বা

কাব্যস্রষ্টাকে শাস্তি দিতে তিনি অস্বীকৃত। কারণ তিনি জানেন কবির সমগ্র উচচারণে, সামগ্রিক উক্তির সামূহিক চেতনায় কাব্যত্ব অন্বেষণ করতে হয়। এবং কবিকণ্ঠের সে উক্তিই যখন আমাদের চমৎকৃত করে, আনন্দ-আন্দোলনে সত্তার গভীরকে আলোড়িত করে, বিস্মিত বিমুগ্ধ করে তখন কাউকে ব'লে দিতে হয় না—এটাই আসল 'কাব্য'।

তাঁর বক্তব্য সর্বত্রই কবি-সচেতন। এবং তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ ক'রেছেন সার্বভৌম কবিশক্তি স্বষ্টি 'বৈচিত্র্য' বা বিচ্ছিত্তি'র ওপর।"যৎ কিঞ্চনাপি বৈচিত্র্যং তৎসর্বং প্রতিভোদ্ভবম"। কুন্তকের কাব্যবিচারের লক্ষ্য স্বাধীন সার্বভৌম কবি-শক্তি নির্মিত বক্রোক্তি, রস উপলক্ষ মাত্র। কারণ, তাঁর মতে কাব্য নির্মাণ রস দিয়ে হয় না, হয় কথা বা উক্তি দিয়ে অর্থাৎ বক্রোক্তির সাহায্যে। কাব্যের উদ্দেশ্য যেখানে রস-স্বষ্টি সেখানেও কবিকে প্রথমেই শরণাপন্ন হ'তে হয় উক্তি বা বক্রোক্তির। ফলে তাঁর বিচারে রস গভীর-অর্থে বক্রোক্তিরই অন্তর্ভুক্ত। কাব্যের সার্থকতা সর্বদাই কথা বা উক্তিনির্ভর এবং সে উক্তি কখনোই কেবল উক্তি নয়—অবশ্যই বক্র-উক্তি এবং এ বক্রোক্তি নির্মাণই কবিত্ব। কুন্তক ব্যাখ্যাত এ বক্রোক্তি যেমন তাবৎ অলঙ্কারের মূল কথা, রীতির অন্তর্নিহিত শক্তি, তেমনি ধ্বনি-রসেরও মূল আধার। সুতরাং তাঁর বিবেচনায় কাব্যবিচারে সবচেয়ে জরুরী বিষয় অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনি বা রস নয়, এ সমস্ত কিছুর সারীভূত রূপবৈচিত্র্য (অভিনবত্ব) সম্পাদনকারী বক্রোক্তির অস্তিত্ব।

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে প্রায়শ কাব্যবিচারের চেয়ে কাব্য-শাসনের প্রবণতা প্রধান। এবং আলঙ্কারিকদের বিধান বশবর্তী না হ'লে কবিকে যে কি পরিমাণ দুর্ভোগ পোহাতে হ'তো তার প্রমাণ বিরল নয়, ভরত থেকে আনন্দবর্ধন পর্যন্ত প্রায় সকলেই কাব্য-ন্যায় বা ঔচিত্যের প্রসঙ্গে ক্ষমাহীন, কিন্তু কুন্তকের বিবেচনায় অভিনবত্ব বা নোতুনত্বই

কাব্যের প্রধান আকর্ষণের হেতু, প্রাণশক্তির বিজ্ঞাপক। তাঁর মতে ঔচিত্যের খাতিরে কাব্যে ঔচিত্য আমদানি সমীচীন নয়, নোতুনত্ব বা অভিনবত্ব সৃষ্টির জন্যে যা উচিত কাব্যে তার বেশী ঔচিত্যের একেবারেই দরকার হয় না। তাঁর ভাষায়,

"সৎ কাব্যাধিগমাদেব নূতনৌচিত্যমাপ্যতে।" (-বক্রোক্তিজীবিত) সুতরাং এ ক্ষেত্রেও কুন্তকের স্বতন্ত্র ভাবনায় 'অভিনবত্ব' কাব্য-নির্মাণে বা আস্বাদনে ঔচিত্যের চেয়ে দীপ্র হ'য়ে উঠেছে। বক্রোক্তি নির্মাণ-কলাকেই তিনি আখ্যায়িত ক'রেছেন 'কবি-কৌশল' হিসেবে। সন্দেহ-অলঙ্কার প্রসঙ্গে রুয্যক যেমন বলেছিলেন, "কবিপ্রতিভোত্থাপিতে সন্দেহে সন্দেহালঙ্কারঃ" কবিপ্রতিভা থেকে জাত ব'লেই সন্দেহ 'সন্দেহ অলঙ্কার'। তা না হ'লে বাস্তব জগতের নিছক সন্দেহ কখনোই সন্দেহ অলঙ্কার হয় না বা হ'তে পারে না। ঠিক তেমনি কুন্তকের মতে কবি-শক্তির কারণেই (সৃষ্টি কৌশলে) সাধারণ উক্তি বক্রোক্তিতে পরিণত হয়, বাক্য মুহূর্তে কাব্যে রূপান্তরিত হয়। [এ মন্তব্যের আলোকে স্মরণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যের 'বধূ' কবিতার কিছু অংশ, যেখানে বলা হয়েছে (সাধারণ কথায় বা উক্তিতে) "আমার চোখের জলের অর্থ কেউ-ই বোঝে না, কেবল সবাই অবাক হ'য়ে কারণ অনুসন্ধান করে।" এটাই যখন কবি-শক্তির স্পর্শলাভ করে, তখন বধূ-হৃদয়ের অন্তরঙ্গ অনুভবে আমরা চমৎকৃত হই।

'আমার আঁখি জল কেহ না বোঝে,
অবাক হয়ে সবে কারণ খোঁজে।'

তখন সরল কথার মধ্যে, সাধারণ উক্তির মধ্যে আসে অসাধারণ ব্যঞ্জনা, অ-সহজ বক্রোক্তি।]

তাই কুন্তকের বিবেচনায় কাব্যের চমৎকারিত্বের জন্যেই বক্রোক্তি আবশ্যিক, আর এ বক্রোক্তিতে যেহেতু বৈচিত্র্য (নোতুনত্ব) সম্পাদনের

অনিবার্য শর্ত, সেজন্যে কাব্যের পালাবদলে, নোতুন যুগের কবিতা নির্মাণেও কুন্তকপ্রবর্তিত 'বক্রোক্তিবাদ' এক উদার প্রশ্রয়ের অফুরন্ত অনুপ্রেরণাভূমি।

কাব্যতত্ত্ব বিচারে কুন্তকের এ প্রথাবিরোধী, বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই হয়তো সনাতন-পন্থী ঐতিহ্যানুসারী প্রাচ্য-পণ্ডিতেরা তাঁকে সীমাহীন উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন এবং আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে বি, এ অনার্স ও এম.এ ক্লাশে (বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যে) প্রাচ্য-কাব্যতত্ত্বের যে পাঠ দেয়া হয়, সেখানেও 'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থের প্রণেতাকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় না এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত এ বিষয়ের সহায়ক গ্রন্থসমূহেও বক্রোক্তিবাদ চরমভাবে উপেক্ষিত। ফলে ধ্বনি-রসবাদের প্রসঙ্গই কেবল প্রাচ্য-কাব্যতত্ত্বের পাঠ্যবিষয়ে পরিণত। অথচ ভারতীয় প্রাচীন কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে (বিশেষত কাব্য-সংজ্ঞার্থ ও আত্ম-অন্বেষায়) কুন্তক প্রণীত বক্রোক্তিজীবিত গ্রন্থ, কোনো অংশেই ধ্বন্যালোক বা সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরঞ্চ সামান্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও (কারণ কুন্তকে উক্তির প্রসঙ্গই উক্ত, কবির জীবন-দর্শন বা কবি-ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে তিনি নীরব এবং কাব্যের সামগ্রিকতাকে গুরুত্ব দিলেও কবি-চেতনার পটভূমি অর্থাৎ তাঁর কাল-সমাজ ইত্যাদি যে কবি-দৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত এ বিষয়ে কিছুই বলেন নি) আধুনিক কালের কাব্য-ভাবনা এবং বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গির (পাশ্চাত্য প্রভাবিত) সঙ্গে আচার্য কুন্তকের প্রবর্তিত বক্রোক্তিবাদের এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্যযোগ্য। ফলে আজকে যাঁরা ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের কৌতূহলী পাঠক কিংবা গবেষক তাঁদের আশু কর্তব্য হ'চ্ছে এ সহৃদয় সমালোচককে নতুন ক'রে আবিষ্কার করা, উদার অভ্যর্থনায় বরণ করা, যেমন তিনি নতুনকে স্বাগত জানাতেন, অলঙ্কারের অচলায়তনের মধ্যে থেকেও।

ধ্বনিবাদ : প্রাচ্য অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাসে 'ধ্বন্যালোক' এর অমল অবদান কেউ-ই অস্বীকার ক'রেন না। এ গ্রন্থের প্রথম কারিকার প্রথম অংশেই ঘোষিত—"কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি" ধ্বনিই কাব্যের আত্মা এবং এটাই ধ্বন্যালোকের মর্মবাণী। ছন্দে রচিত এ কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থটিতে চারটি উদ্যোতে সর্বমোট পদসংখ্যা—একশো ষোলটি। ধ্বনি-কারিকা গ্রন্থটির মূল রচয়িতার নাম অজ্ঞাত, আনন্দবর্ধন 'আলোক' নামে বৃত্তি অংশের লেখক, অভিনব গুপ্ত এ আলোক বা বৃত্তির টীকা লিখেছেন 'লোচন' নামে। অর্থাৎ ধ্বন্যালোকের কারিকা (যাঁর নাম জানা যায় নি) তাঁর বৃত্তি বা আলোক (আনন্দবর্ধন) এবং বৃত্তির টীকা লোচন (অভিনব গুপ্ত)—এ তিনের সমন্বিত ফল ধ্বনিবাদ, যাকে অনেকে "ধ্বনিবাদের ত্রিবেণী-সঙ্গম" বলে থাকেন। আচার্য শ্যামাপদ চক্রবর্তীর মূল্যায়নে—"আজ ধ্বন্যালোক বলতে আমরা বুঝি পদ্যাত্মক ধ্বনিগ্রন্থ—আনন্দ বর্ধনের বৃত্তি, অভিনব গুপ্তের 'লোচন' অর্থাৎ ধ্বনিবাদের শৈশব, কৈশোর আর পূর্ণ যৌবন।"—অলঙ্কারচন্দ্রিকা।

পণ্ডিতদের অনুমান আচার্য আনন্দবর্ধনের কাল নবন শতাব্দ এবং এর প্রায় একশত বছর পর অভিনব গুপ্ত ধ্বনিবাদকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। প্রাচ্য কাব্যতত্ত্বে ধ্বনিবাদীদের প্রবল প্রভাব ও প্রচার হেতু অন্যান্য মতবাদ অনেকটা নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। কাব্য সংজ্ঞার্থ নির্ণয় কিংবা কাব্যের আত্মা নিরূপণে তাঁদের মন্তব্যকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হ'য়ে থাকে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোতে অদ্যাবধি তাঁদের মতবাদই শ্রেষ্ঠ ব'লে অনেকের ধারণা। অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের ধ্বনি অধ্যায়ের অন্তিমে উচচারণ ক'রেছেন—"লেখকের মতে কাব্য সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে খাঁটি কথা কোনো দেশে, কোনো কালে আর কেউ বলেন নি।"—কাব্যজিজ্ঞাসা।

"ধ্বনি" কাব্যতত্ত্বের একটি পারিভাষিক শব্দ। এ ধ্বনি বলতে বোঝায় কাব্যের একটি বিশেষ অর্থ, যা কাব্যে বা কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর সাক্ষাৎ অর্থ নয়, অথচ সে শব্দার্থ বা বাচ্যার্থকে অবলম্বন করে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় প্রতীয়মান হয়ে ওঠা অন্য একটি অর্থ। অর্থাৎ যখন কোনো সহৃদয় পাঠক কাব্য পড়েন, তখন তিনি কেবল কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থেই তৃপ্ত নন, সেই বাচ্যার্থকে অতিক্রম ক'রে তাঁর চেতনায় প্রতীয়মান হ'য়ে ওঠে ভিন্ন আরেকটি গভীরতর ব্যঞ্জনাময় অর্থ. কাব্যতত্ত্বের পরিভাষায় বাচ্যার্থ অতিক্রমী সেই প্রতীয়মান অর্থই 'ধ্বনি'। এ অর্থ অবশ্যই বাচ্যার্থের সাহায্যে ব্যঞ্জিত বা প্রতীয়মান, আর যে প্রক্রিয়ায়, ব্যাপারের ফলে, ধ্বনি প্রতীতি জন্মে তাকে বলা হয় ব্যঞ্জনা বা ধনন ব্যাপার। ধ্বনিবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে,---কাব্যের আত্মা শব্দ নয়, অর্থ নয়, অলঙ্কার রীতিও নয়, এ সবের অতিরিক্ত অন্য কিছু। এ অন্য কিছু কি? যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ ক'রে প্রতীয়মান অর্থ ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রকাশ করে, সেখানে সে ব্যঙ্গ্যার্থরূপ কাব্যবিশেষকেই পণ্ডিতগণ (সূরভিঃ) ধ্বনি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

অবশ্য ধ্বন্যালোকের আগেও ধ্বনি ছিলো তার প্রমাণ এ গ্রন্থেই বর্তমান: 'কাব্যস্যাত্মা' ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাত-পূর্ব।' অর্থাৎ কাব্যের আত্মা ধ্বনি বলে সুধীগণ (বুধগণ) কর্তৃক আগেই (পরম্পরাক্রমে) (যা) সম্যকরূপে কথিত হয়েছে। কিন্তু পূর্বকথিত এ ধ্বনি বিশেষ অলঙ্কারের পর্যায়েই ছিলো। এবং অলঙ্কার হ'তেই ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি এসেছে। পর্যায়োক্ত, সমাসোক্তি, ব্যাজস্তুতি কিংবা অপ্রস্তুত প্রশংসা প্রভৃতি অলঙ্কারের মূল ব্যাপারই ব্যঞ্জনা ঘটিত। পর্যায়োক্ত অলঙ্কার তো এক অর্থে ধ্বনিরই নামান্তর। "পর্যায়োক্তং যদন্যেন প্রকারেণভিধায়তে।" অর্থাৎ বক্তব্য সাক্ষাৎভাবে না ব'লে যেখানে অন্যভাবে বলা হয়

(অভিহিত), সেখানে (হয়) পর্যায়োক্ত অলঙ্কার। দণ্ডীর কাব্যাদর্শেও এ ধরনের বক্তব্যের সাক্ষাৎ মেলে—

"অর্থম্ ইষ্টম্ অনাখ্যায় সাক্ষাৎ তস্যৈব সিদ্ধয়ে।
যৎ প্রকারান্তরাখ্যানাং পর্যায়োক্তং তদিষ্যতে।।" (কাব্যাদর্শ)

আকাঙ্ক্ষিত অর্থ সরাসরি ব্যক্ত না ক'রে সেটা পাওয়ার জন্য (তারই সিদ্ধির নিমিত্ত) অন্যভাবে ব্যক্ত করলে, তা-ই পর্যায়োক্ত।

অতএব দেখা যাচ্ছে আনন্দবর্ধন এবং অভিনব গুপ্ত যে পূর্ণাঙ্গ ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন, তার ভিত্তি পূর্বেই গ্রথিত ছিলো। তবে পণ্ডিতদের অনুমান 'ধ্বনি' শব্দটি আলঙ্কারিকেরা গ্রহণ ক'রেছেন ব্যাকরণশাস্ত্র থেকে। ব্যাকরণের বিশ্লেষণ অনুসারে কোনো শব্দকেই একেবারে উচ্চারণ করা যায় না, একটা একটা ক'রে বর্ণ উচ্চারণের মাধ্যমে সমগ্র শব্দটি উচ্চারিত হয়। যেমন 'চরম' শব্দটি যখন বর্ণানুক্রমে উচ্চারিত হয় তখন, চ-র-ম। শ্রোতার কাছে 'চ' ও 'র' বর্ণের অনুভব-জনিত সংস্কারের সঙ্গে অন্তিম 'ম' বর্ণটি অনুভূয়মান হবে। অতএব শ্রোতার চিত্তে অর্থ প্রতীতি সৃষ্টিকারী বা অনুভূয়মান চরম বর্ণটিকে (এখানে 'ম') বলে ধ্বনি। শ্রোতার কাছে সাক্ষাৎভাবে অর্থের প্রতীতি সৃষ্টিকারী পদই বৈয়াকরণ কথিত "স্ফোট"। অতএব, ব্যাকরণশাস্ত্র অনুসারে যেমন অর্থের অনুভব সৃষ্টিকারী (চরম বর্ণাত্মক শব্দরূপে) প্রধানীভূত 'স্ফোট'কে বুঝায়, তেমনি ধ্বনিবাদীদের মতে 'ধ্বনি' হ'চ্ছে কাব্যের বাচ্যার্থ অতিরিক্ত (অতিক্রমী) প্রধানীভূত প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট হ'তে পারে; ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের,—

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরষায়।" (মানসী)

এখানে দু'টো পংক্তিতে শব্দ আছে মোট আটটি (৫ + ৩). এর বাচ্যার্থ বা আক্ষরিক অর্থ এতো সহজ-সরল যে ব্যাখ্যা করার কোনো অপেক্ষা রাখে না। যে কোনো পাঠক এর আভিধানিক অর্থ অনায়াসে উদ্ধার করতে পারেন। কিন্তু তা'তেই কি উদ্ধৃত পংক্তির বা কবিতাংশের আবেদন ফুরিয়ে যায়? কোনো পাঠক কি কেবল এর বাচ্যার্থে তৃপ্ত হন? নিঃসন্দেহে উত্তর নেতিবাচক হ'তে বাধ্য। তা'হলে কাব্যরসিকমাত্রে সন্ধান করেন বাচ্যার্থের অতিরিক্ত কিছু —এ অতিরিক্ত কিছুই হ'চ্ছে ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি। সে ব্যঙ্গার্থ আসে অবশ্য বাচ্যার্থের সরণী ধরেই। যেমন পূর্বোক্ত দীপ শিখাকে আশ্রয় করে প্রভার আবির্ভাব কিংবা অঙ্গনাদেহকে ঘিরে লাবণ্যের প্রকাশ। এজন্যেই ধ্বনিবাদীরা বলেন:

"শব্দার্থশাসেনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে স হি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্।।" (ধ্বন্যালোক, ১।৭)

অর্থাৎ কাব্যের যে আসল অর্থ তা কেবলমাত্র শব্দার্থের জ্ঞানে উপলব্ধি করা যায় না, একমাত্র কাব্যার্থতত্ত্ব-বোদ্ধারা সে অর্থ গ্রহণে (জানতে) সক্ষম।

সুতরাং ধ্বনিবাদীদের বক্তব্যের সারাৎসার হ'চ্ছে. কাব্যের শরীর নির্মিত হয় বাক্য দিয়ে (যে বাক্য কতকগুলো অর্থপূর্ণ শব্দ-সমবায়ে গঠিত)। আর সে কাব্যে ব্যবহৃত বাক্যাবলীকে সুন্দর ক'রে সাজালে (অলঙ্কার সংযোগ) নিশ্চয়ই তা সুন্দর শোনতে পারে কিন্তু সেটা প্রকৃত কাব্য হবে কিনা সেটা বলা যায় না। কারণ অলঙ্কার বাইরের জিনিস আরোপিত বস্তু, কাব্যের অস্থির বা অনিত্য ধর্ম তার এমন কোনো শক্তি নেই, যার দ্বারা সর্বত্র বাচ্যার্থের অতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনিকে ধারণ করতে সক্ষম। সর্বকালের শ্রেষ্ঠকাব্যের ধর্মই হ'চ্ছে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি সৃষ্টি। পৃথিবীর

তাবৎ সাহিত্যের এমন নিদর্শন বিরল নয়, যেখানে তথাকথিত অলঙ্কারে কাব্য আদৌ সমৃদ্ধ নয়। ধ্বনিবাদীরা প্রথমেই আমাদের সচেতন ক'রে দিয়েছেন যে কাব্যে ব্যবহৃত যে অনুপ্রাস-উপমাদি (অলঙ্কার) বাচ্য-বাচকের অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের শোভা বর্ধন করে, ধ্বনি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।

("বাচ্যবাচক চারুত্ব হেতুভ্য উপমাদিভোহনুপ্রাসাদিভ্যশ্চ বিভক্ত এব।") ফলে ধ্বনিবাদীদের মতে অলঙ্কার কাব্যের আত্মা ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে না। কারণ, অঙ্গনাদেহে লাবণ্য না থাকলে শত অলঙ্কারে বিভূষিতা করলেও তাকে যেমন সুন্দরী বলা যায় না এবং লাবণ্যময়ী নারীকে কোনো অলঙ্কার না পরালেও তার স্বভাব-সৌন্দর্য যেমন ঢাকা পড়ে না, ঠিক তেমনি জমকালো অলঙ্কারে সজ্জিত বাক্যও কাব্য হয় না (ধ্বনির অভাবে) আবার অলঙ্কারহীন বাক্যও সার্থক কাব্য হয় যদি তা'তে 'ধ্বনি' থাকে দীপ্র। উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যটি স্পষ্ট হতে পারে।

প্রথমেই বৃত্ত্যানুপ্রাসের (একই ব্যঞ্জনধ্বনির যুক্ত বা বিযুক্তভাবে বৃত্তি এ অনুপ্রাসের ধর্ম) আড়ম্বরপূর্ণ উদাহরণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

"মঞ্জু বিকচ কুসুমধুপুঞ্জ মপশব্দ গঞ্জিগুঞ্জ
কুঞ্জর গতিগঞ্জিগমন মঞ্জলকুলনারী।"
ঘনগঞ্জন চিকুব-পুঞ্জ মালতীফুলমালেরঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জনগতিহারী।।—জগদানন্দ।

এখানে যুক্ত ব্যঞ্জন 'ঞ্জ' তেরবার ব্যবহৃত, অতএব অনুপ্রাস অলঙ্কারের সার্থক উদাহরণ হিসেবে বহু গ্রন্থে উদ্ধৃত, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত অনুপ্রাসই এখানে কবি-ভাবনার সর্বনাশের হেতু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে একান্তভাবে অলঙ্কারহীন, অন্তরঙ্গ শব্দাবলীতে গ্রথিত যতীন্দ্র মোহন বাগচীর 'অন্ধবধূ'কে,—

"পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি।
আস্তে একটু চল্‌না ঠাকুর-ঝি—
ওমা, এ যে ঝরা বকুল, নয়?"· · · · ·

দৃষ্টিশক্তিহীনা অন্ধবধূর অন্তরঙ্গ উপলব্ধির প্রকাশে এ কবিতা বাইরের অলঙ্কারে বঞ্চিতা হ'য়ে চেতনার প্রগাঢ়তায় বাচ্যার্থকে অতিক্রম ক'রে ব্যঙ্গ্যার্থে সমুজ্জ্বল।

'মাহভাদরে' যখন অবিরাম বৃষ্টি এবং 'শালের বনে থেকে থেকে' ঝড়ে দোলা দিচ্ছে, তখন বাইরের সে বন-প্রকৃতি কিভাবে কবির মন-প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলে তারই এক অবিস্মরণীয় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্র-নাথের গীতাঞ্জলিতে—

"অন্তরে আজ কি কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল,
হৃদয় মাঝে জাগল পাগল
আজি ভাদরে।
আজ এমন ক'রে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে।"

প্রায় অলঙ্কারহীন এ পংক্তিমালায় বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ একাকার হ'য়ে গেছে ব্যবহৃত শব্দাবলীর আভিধানিক বা বাচ্যার্থে অতিক্রমী ব্যঙ্গ্যার্থে বা ধ্বনিতে।

ধ্বনিবাদীদের বক্তব্য হ'চ্ছে,— কেবল অলঙ্কার কাব্যকে বাঁচাতে সক্ষম নয়, যদি সেখানে না থাকে ধ্বনির উজ্জ্বল উপস্থিতি, সুতরাং কাব্য-ত্বের মূল ব্যাপার হ'চ্ছে ধ্বনি এবং সে কারণে ধ্বনিই কাব্যের আত্মা।

রীতিবাদ প্রসঙ্গে ধ্বনিবাদীদের বক্তব্য আরো স্পষ্ট, লাবণ্যহীন শরীরে অলঙ্কার সংযোগে যেমন প্রত্যাশিত সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি নির্দোষ অবয়বের অধিকারী মাত্রেই সুন্দর নয়, যদি তার লাবণ্যের

ঘাটতি থাকে লক্ষণীয়। ফলে সর্বক্ষেত্রে (শরীরে, অবয়ব সংস্থানে, কিংবা কাব্যে) মূল প্রত্যাশিত ব্যাপার হ'চ্ছে লাবণ্য বা ধ্বনি। সুতরাং রীতি বা স্টাইল কাব্যের আত্মা হ'তে পারে না। রীতিকে কাব্যের আত্মা হিসেবে চিহ্নিত করা গেলে বৈচিত্র্যকেই কাব্য বলা যেতো কোনো বাঁকা (ট্যারা) চোখের লোক যখন রঙিন চশমা পরে কিংবা কোনো বিরল কেশের অধিকারিণী আধুনিকা রমণী যখন নকল খোঁপা পরে তখন তা'তে চাতুর্য প্রকাশ পায় মাধুর্য সৃষ্টি হয় না। অতএব কেবল বলার কায়দায় কিংবা বিশিষ্ট পদ রচনার কৌশলে বা রীতিতে কাব্য উৎরে যায় না। চতুর বচন বিন্যাসে সাময়িকভাবে পাঠককে ধোকা দিয়ে তাৎক্ষণিক বোকা বানাতে পারা গেলেও, স্থায়ীভাবে বশীভূত করা অসম্ভব। ফলে রীতি যথারীতি চাতুর্য মাত্র, সৌন্দর্য নয়, এবং এ চাতুর্যে বাচ্যের অতীত, বাস্ত-বাতীত কোনো কিছু প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব নয়। ধ্বনিবাদবিরোধীরা কাব্যে ধ্বনির অস্তিত্ব সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তার উত্তরে ধ্বনিবাদী-দের বক্তব্য হচ্ছে,— কাব্যের 'ধ্বনি' বাচ্যার্থের মতো স্পষ্ট বাস্তব জিনিস নয় যে, অভিধান কিংবা ব্যাকরণে জ্ঞান থাকলেই তা বোঝা যাবে কিংবা জ্যামিতির সম্পাদ্য নয় যে বোর্ডে নিখুঁতভাবে এঁকে দেখানো যাবে। এটা একান্তভাবে অনুভূতিগ্রাহ্য ব্যাপার, যার সামান্যতম কাব্যবোধ আছে, তার পক্ষেই কেবল অনুভব করা সম্ভব, শব্দ ও অর্থের অতীত জিনিসটি (ধ্বনি) কাব্যে কতখানি অপরিহার্য। এবং বাচ্যার্থের অতিরিক্ত এ ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির অস্তিত্ব কিভাবে একটি অতি সাধারণ বাক্যকে অসাধারণ ক'রে তোলে, শ্রেষ্ঠ কাব্যের অভিধায় ভূষিত করে। অতএব প্রাগুক্ত কারণে ধ্বনিবাদীদের বক্তব্য, ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। সে ধ্বনি কিসের ধ্বনি। ধ্বনিবাদীদের উত্তর, —সে ধ্বনি রসের ধ্বনি। অর্থাৎ কাব্যের আত্মা ধ্বনি বলে যাঁরা শুরু ক'রেছেন, কাব্যের আত্মা রস ব'লে তাঁরাই পরিসমাপ্তি টেনেছেন। ধ্বনি কাব্যের আত্মা বোঝাতে গিয়ে

প্রকারান্তরে রসকেই আত্মা হিসেবে ঘোষণা ক রেছেন। কিন্তু ধ্বন্যালোক কারিকায় ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা বলা হ'য়েছে। ভরত ব্যাখ্যাত রসের বারবার উল্লেখ থাকলেও ধ্বনি ও রস পরিণামে এক, এবং রসই কাব্যের আত্মা—এটা কোথাও বলা হয় নি। সম্ভবত ধ্বনি ও রসের ঐক্য-স্থাপনের প্রধান স্থপতি বৃত্তিকার আনন্দবর্ধন ও টীকাকার অভিনব গুপ্ত। কারণ তাঁরা হয়তো এ সত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের সারতত্ত্ব হচ্ছে রসতত্ত্ব (কারণ, এ তত্ত্বই ভারতীয় ধর্ম-দর্শন ও সংস্কৃতির মর্মভাষ্যের সঙ্গে গভীরভাবে একাত্ম) এবং সে রসতত্ত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ নিবিড় সংযোগ ব্যতিরেকে ধ্বনিবাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হ তে পারে। তাই প্রথমে আনন্দবর্ধনের ঘোষণা : "রসোদয়ো হি দ্বয়োরপি তয়ো জীবভূতাঃ।" (ধ্বন্যালোক, বৃত্তি ৩/১৩) অর্থাৎ রসাদিই এ দু'য়ের (নাট্য ও কাব্য) জীবন (জীব-ভূত) এর পরে অভিনব গুপ্তের চরম সিদ্ধান্ত : নহি তচ্ছূন্যং কাব্যং কিংচিদস্তি।" (ধ্বন্যালোক, টীকা, ২/৩) অর্থাৎ রসহীন কোনো (প্রকার) কাব্য নেই। এখানেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি আরো স্পষ্টভাবে রসের প্রাধান্য ঘোষণা করলেন : "তেন রস এব বস্তুত আত্মা বস্তুলঙ্কারধ্বনী তু সর্ব্বা রসং পর্যবস্যেতো।" (ধ্বন্যালোক, টীকা, ১/৫) সুতরাং রসই বস্তুত আত্মা, বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি সর্বপ্রকারে আশ্রয় লাভ করে (পর্যবসান হয়)। ফলে ধ্বন্যালোকে পরিশেষে কাব্যের সত্যকার আত্মারূপে রসকেই চিহ্নিত করা হয়েছে, অবশ্য সে রসের প্রকাশ ঘটেছে ধ্বনিরূপে। এবং অভিনব গুপ্তের মতে রসধ্বনিই কাব্যের আত্মা। "রসধ্বনেঃ এব সর্ব্বত্র মুখ্যভূতম্ আত্মত্বম্"। (ধ্বন্যালোক, টীকা) অভিনব গুপ্তের মন্তব্যে জানা যায়, রসধ্বনি, বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি বলে ধ্বনি কাব্যের এ তিনটি শ্রেণী বিভাজন মূল্য কারিকাকার করেন নি করেছেন বৃত্তিকার আনন্দবর্ধন।—"এতৎ তাবৎ ত্রিভেদত্বং ন কারিকা-কারেণ কৃতম্। বৃত্তিকাকারেণ তু দর্শিতম্। (ধ্বন্যালোক বৃত্তি) এ যে

তিন প্রকার ভেদ (বস্তু-অলঙ্কার-রসরূপে). তা কারিকাকারের নয় (কৃত নয়) বৃত্তিকার কর্তৃক দেখানো হ'য়েছে। আমরা এখন আনন্দবর্ধন উল্লেখিত অভিনব গুপ্ত ব্যাখ্যাত এ তিন প্রকার ধ্বনির সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রে বর্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানবো।

বস্তুধ্বনিঃ বস্তু মানে বিষয়বস্তু, রসের সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। না থাকলেও তেমন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, ধ্বনিমহিমা নিরূপণই আমাদের প্রধান কর্তব্য। উদাহরণের সাহায্যে বস্তুধ্বনির স্বরূপ উপলব্ধি করা যেত পারে।

(১) "এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হ'তে মর্ত্তভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ;. . . . . . .রবীন্দ্রনাথ

এখানে রতি স্থায়ী ভাব হ'লেও বিশ্বের কবিতারূপা বাসনালোক-চারিণী কবি-মানসীর সঙ্গে তো দৈহিক শৃঙ্গার অসম্ভব। ফলে কবি-মানসীর অনন্তের মাঝে, স্বর্গ হ'তে মর্ত পর্যন্ত বিহার, সন্ধ্যার রঙে আঁচল রাঙানো এবং ঊষার আলোকে মেখলা নির্মাণ বস্তুত কবির দিগ্‌দিগন্ত-পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য-চেতনারই প্রকাশ এবং এটাকেই বলা যায় শুদ্ধ বস্তুধ্বনি।

(২) নয়নের তারাহারা করিরে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই।

এটা রাবণ-মহিষী মেঘনাদ-জননী মন্দোদরীর উক্তি। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশের পূর্ব-মুহূর্তে বিদায় নিতে এসেছে জননীর কাছে পুত্র ইন্দ্রজিৎ-মেঘনাদ। জননীর কাছে তার প্রিয়পুত্র 'নয়নের তারা' অবশ্যই। কিন্তু মধুসূদন 'নয়নের তারা' এ রূপক অলঙ্কারে মন্দোদরীর হৃদয়ের

গভীরতর সমাচার জানান নি, এবং এক্ষেত্রে অলঙ্কার বর্ণনা কবির আদৌ-অভিপ্রেত নয়, এর দ্বারা তিনি মন্দোদরী-হৃদয়ের আরো গভীরতম শঙ্কার সমাচার জানাতে প্রয়াসী। ফলে নয়নের তারা এ রূপক অলঙ্কারকে অতিক্রম ক'রে মুখ্য হ'য়ে উঠেছে মেঘনাদের প্রত্যাসন্ন মৃত্যুরূপ বস্তুধ্বনি।

অলঙ্কার ধ্বনি: যেখানে অলঙ্কারের বাহ্য-লক্ষণের অভাব সত্ত্বেও বাচ্যার্থে নিজের শক্তিতে বা সামর্থ্যে কোনো অলঙ্কারকে ব্যঞ্জিত বা ধ্বনিত করে, সেখানেই অলঙ্কার-ধ্বনির প্রতীতি জন্মে। যেমন,—

'যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা ।।"—রবীন্দ্রনাথ।

এখানে উপমেয় প্রজাপতি, উপমান ইন্দ্রধনু. অলঙ্কার ব্যতিরেক কিন্তু স্পষ্ট বা বাহ্যলক্ষণ নেই ব্যতিরেকের। বাচ্যার্থের সামর্থ্যে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, প্রজাপতি ইন্দ্রধনুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সুন্দরতর। কারণ রঙের দিক থেকে প্রজাপতি ও ইন্দ্রধনু সমজাতীয়, কিন্তু 'মোর ধরণীর' প্রজাপতিটির (টি এখানে স্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশক) বলায় (কবির প্রীতির প্রাবল্যে) 'সুদূর আকাশে'র 'সে' ইন্দ্রধনুর চেয়ে হ'য়ে উঠেছে সুন্দরতর। অতএব এটা অলঙ্কার (ব্যতিরেক) ধ্বনির সার্থক উদাহরণ।

রসধ্বনি: আচার্য অভিনব গুপ্তের বিবেচনায় 'রসধ্বনি'ই শ্রেষ্ঠ ধ্বনি। বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীভাব সংযোগে পাঠকচিত্তে স্থায়ী ভাবের যে আনন্দময়ী চর্বনা (ধ্বন্যালোকে-চর্বনা, আস্বাদন, রসনা, প্রতীতি – একই অর্থে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত) বা প্রতীতিই রসধ্বনি। অর্থাৎ সহজ কথায়---পাঠকচিত্তে অভিব্যক্ত তাঁর নিজস্ব যে স্থায়ীভাব, তারই আনন্দময় আস্বাদনকে রস বলা যায়। রসধ্বনির উদাহরণ যে

কোনো রসোত্তীর্ণ কাব্যেই সুলভ। রবীন্দ্রনাথ থেকে আর একটিমাত্র উদাহরণ সংযোজিত হলো।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে,
দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ ক'রো না পাখা।।

—এখানে স্থায়ীভাব মানুষের জীবনের গতিবেগ, আর এ ভাবকে পুষ্ট-সমৃদ্ধ করে তুলছে আশঙ্কা, ক্লান্তি, সংশয়, উদ্যম প্রভৃতি ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। ফলে ছন্দ, ভাব, অনুভাব, ধ্বনি, অলঙ্কার ও রীতির পরস্পরের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ রসোত্তীর্ণ কবিতা অর্থাৎ 'রসধ্বনির' সার্থক উদাহরণ।

রস
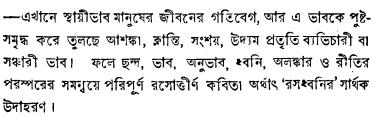
'রস' প্রাচ্য-কাব্যতত্ত্বের একটি পারিভাষিক শব্দ। 'রস'-ধাতুর মূল অর্থ হচ্ছে, আস্বাদন করা (to taste)। আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' (পণ্ডিতদের অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দে) থেকে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের 'রসগঙ্গাধর' (১৭শ শতাব্দ) পর্যন্ত নানা গ্রন্থে 'রস' প্রসঙ্গে ব্যাপক ও গভীর আলোচনা হয়েছে। এবং ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে রসতত্ত্ব সর্বাধিক দীপ্র অধ্যায় হিসেবে কীর্তিত। প্রাচ্য-কাব্যতত্ত্বের প্রধান পুরুষ মনীষী ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' চরম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন: "—নহি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদর্থ: প্রবর্ততে।" (নাট্য শাস্ত্র, ৬/৩৪)-অর্থাৎ রস ব্যতিরেকে কোনো বিষয়েরই প্রবর্তনা (সূচনা বা সূত্রপাত) হয় না।

আচার্য ভরত রসের এ সর্বব্যাপী-সর্বগ্রাহী স্বরূপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করেই আত্মজিজ্ঞাসার সরণীতে রসের সংজ্ঞার্থ সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। নিজেই প্রশ্ন রেখেছেন—,'অত্রাহ, রস ইতি কঃ পদার্থ?" অর্থাৎ রস কোন পদার্থকে বলে? এর উত্তর অন্বেষায় তাঁর সিদ্ধান্তের সারাৎসার হচ্ছে— "আস্বাদ্যত্বাৎ (নাট্যশাস্ত্র, ৬/৩৫)— যা আস্বাদিত হয়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দের খ্যাতিমান রসবাদী কাব্য-তাত্ত্বিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর অমর কীর্তি 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে প্রতি-ধ্বনিত করলেন ভরত-উচ্চারিত এ কথামালাকেই: "রস্যতে ইতি

রসঃ" (সাহিত্যদর্পণ, ১/৩)। অর্থাৎ যা রসিত বা আস্বাদিত হয়, তা-ই 'রস'। এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ রসের ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে তাঁর প্রতীতিকে প্রকাশ করলেন: "সর্বোঽপি রসনাদ্ রসঃ" (সাহিত্যদর্পণ, ৩।৪২)। অর্থাৎ রসন বা আস্বাদন-হেতু সবই রস। বিশ্বনাথ কবিরাজের আগে একাদশ শতাব্দের শেষ কিংবা দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে ধ্বনিবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে পরিচিত কাব্যতাত্ত্বিক আচার্য মম্মটভট্ট তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে ঘোষণা করেছিলেন,— "পানক রস-ন্যায়েন চর্ব্যমানঃ" (কাব্যপ্রকাশ, ৪।২৮) এর নিহিতার্থ হচ্ছে— (রস) পানা বা সরবতের রসের মতো আস্বাদ্যমান। ধ্বন্যালোকের 'লোচন'-টীকায় আচার্য অভিনব গুপ্ত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানালেন রসের সার্বভৌম শক্তি-সম্পর্কে: "নহি তুচ্ছন্যং কাব্যং কিংবিদস্তীতি" (ধ্বন্যালোক, ২।৩ টীকা)। অর্থাৎ রসহীন বা রস ছাড়া কোনোও কাব্য (কাব্যের অস্তিত্ব) নেই (সম্ভব নয়)। (কেবল কাব্যতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা-ভাষ্যে নয়) ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের প্রবক্তারাও রসের অপার মহিমা কীর্তনে আদৌ কার্পণ্য করেন নি। উপনিষদের ঋষিগণ ব্রহ্ম বা আত্মাকে অনেক সময় 'আনন্দ' শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। আবার অনেক-ক্ষেত্রে এ 'আনন্দ' বা ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় তাঁরা 'আনন্দ'-এর বিকল্প শব্দরূপে নির্বাচন করেছেন 'রস' শব্দটিকে। এবং তাঁদের এ দ্বিধাহীন প্রয়োগের উজ্জ্বল উদাহরণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে: "রসো বৈ সঃ হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" (ব্রহ্মানন্দ-বল্লী, ২।৭) —অর্থাৎ রসই তিনি (ব্রহ্ম), কারণ রসকে লাভ করেই এ জীব (বা পুরুষ) আনন্দীভূত বা আনন্দিত হয়।

ফলে, উপনিষদে বর্ণিত 'ব্রহ্ম' থেকে শুরু করে কটু, অম্ল, কষায়, লবণ, তিক্ত ও মধুর—এ-ছয় প্রকার জাগতিক জীবনের রসনা-নির্ভর স্বাদও প্রকৃত-প্রস্তাবে রস-সম্পৃক্ত। এবং আস্বাদন করা (to taste)

অর্থে 'রস'-এর ব্যাপক ব্যবহার ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের আদিপর্বে প্রবল প্রাধান্য পেলেও পরবর্তীকালের সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে অনুভব করা (to feel) কিংবা ভালোবাসা (to love) অর্থেও 'রস' ধাতুর বহুল প্রয়োগ দৃষ্টি এড়াবার নয়। বস্তুত সংস্কৃত-ভাষায় এ 'রস' ইক্ষুরস, সার, স্বর্ণ, বীর্য, দুগ্ধ, দ্রবপদার্থ, জল, অমৃত, মধু, পারদ, মদ এমনকি বিষ বা জহর অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'রস'-এর মূল অর্থ যেহেতু 'স্বাদ'; সেজন্যে এ-ধরনের স্বাদ-সম্পৃক্ত শব্দাবলীকে বোধ হয় রসিক সাধারণ 'রস' অর্থে প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হন নি।

কাব্যতত্ত্বে যেহেতু আমাদের বিবেচ্য বিষয় কেবল নাট্য বা কাব্য রস, সে-হেতু সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত বিচিত্র রসের সমাচার আদৌ জরুরী নয়। আমরা জানি, আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে আচার্য ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে প্রথম রসবাদের সূচনা করেন। পরবর্তীকালে দণ্ডী, ভামহ কিংবা বামন প্রমুখ আচার্যগণ তাদের কাব্য-তত্ত্ব বিচারে রসের অম্লান প্রাধান্যকে স্বীকার করেননি। অতিক্রান্ত হয় সহস্র বৎসর, ধ্বনিবাদীরা (নবম থেকে একাদশ শতাব্দ পর্যন্ত) হাজার বছরের উপেক্ষিত 'রসবাদে' নতুন প্রাণ-সঞ্চার করেন। বস্তুত পক্ষে রসবাদের প্রবল প্রসার ঘটে তাঁদেরই প্রচেষ্টায়। ধ্বন্যালোকে আচার্য অভিনব গুপ্ত ঘোষণা করলেন, কাব্যের আত্মা --'রস-ধ্বনি'। মম্মটভট্ট 'কাব্যপ্রকাশ' এ প্রকাশ করলেন, অলঙ্কারশাস্ত্র বা কাব্যতত্ত্বের মুখ্যবস্তু কিংবা সারাৎসার হচ্ছে—'রস'। এবং এরপর অদ্যাবধি একাধিক কাব্যতাত্ত্বিক রসবাদের সমর্থনে রচনা করেছেন সংখ্যাধিক গ্রন্থ। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে 'রসবাদ' পরিণত হয়েছে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ে। তাই আজও দেশে-বিদেশে ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের মুখ্য মতবাদ হিসেবে 'রসবাদ'ই চিহ্নিত এবং সুধী-জন স্বীকৃত।

আমরা এবারে রসবাদের আদি-প্রবক্তা আচার্য ভরতের এবং পরবর্তী কালের রসবাদী কাব্যতাত্ত্বিকদের কতিপয় উক্তির আলোকে রসের প্রাথমিক পরিচয় গ্রহণে প্রয়াস পাবো।

নাট্যশাস্ত্রে মুনিগণ আচার্য (ভরত)-কে জিজ্ঞাসা করলেন:

"যে রসা ইতি পঠ্যন্তে নাট্যে নাট্য-বিচক্ষণৈঃ।
রসত্বং কেন বৈ তেষাম্ এতদ্ আখ্যাতুম্ অর্হসি॥"
—নাট্যশাস্ত্র, ৬/২

—নাট্য-বিশারদ (বিচক্ষণ) ব্যক্তিবৃন্দ নাট্য-শাস্ত্রে যে রসসমূহের বিষয় (কথা) পড়েন (পাঠ করেন), আমাদের বলুন, তাদের রসত্বের হেতু কি (রসত্ব কেন)?

উত্তরে আচার্য ভরত তাঁদের জানালেন:

"শৃঙ্গার-হাস্য-করুণা রৌদ্র-বীর ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যাষ্টৌ নাট্যে রসা স্মৃতাঃ॥"
ঐ ৬/১৬

—অর্থাৎ পণ্ডিতেরা নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত নামে এ আট প্রকার রসকে স্মরণ (স্বীকার) ক'রে থাকেন। এবং তিনি আটটি রসের উল্লেখ ক'রেই আটটি স্থায়ীভাবে সম্পর্কেও অবহিত করলেন তাঁদের:

"রতি হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥"
—নাট্যশাস্ত্র, ৬/১৮

—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় এ আটটি স্থায়ীভাব বলে প্রকীর্তিত (অর্থাৎ পূর্বেই প্রকৃষ্টরূপে বা সম্যকভাবে কথিত)।

এরপর তিনি উল্লেখ করলেন তেত্রিশটি ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের এবং পরিশেষে রসের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করলেন:

"নহি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ততে।
তত্র বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্-রস নিষ্পত্তি॥
—নাট্যশাস্ত্র, ৬/৩৪

—রস ব্যতিরেকে কোনো বিষয়ই (অর্থ) প্রবর্তিত হয় না। সেই (নাট্য বিষয়ে) বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

মনীষী ভরতের উচ্চারিত এ 'রস-নিষ্পত্তি'র 'নিষ্পত্তি' শব্দটিকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালের পণ্ডিত-সমাজে বিতর্কের অন্ত নেই। কা'রো ব্যাখ্যায় 'নিষ্পত্তি'র নিহিতার্থ 'উৎপত্তি'তে পর্যবসিত, কা'রো ভাষ্যে 'অনুমিতি', কেউ বলেছেন 'নিষ্পত্তি' মানে 'ভুক্তি', আবার কেউ এ-টিকে বিবেচনা করেছেন 'অভিব্যক্তি' রূপে। এবং তাঁদের ব্যাখ্যা-ভাষ্য (বিশেষ ক'রে অভিনব গুপ্ত, বিশ্বনাথ কবিরাজ ও পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের) বহুলাংশে বেদান্ত মতানুসারী। আমরা প্রাজ্ঞ পণ্ডিত সমাজের এ জটিল বিতর্কে জড়িয়ে প'ড়ে রসিক পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে আদৌ আগ্রহী নই। তাই আমাদের বিবেচনায় রসের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যার পূর্বে একান্ত প্রয়োজন রসতত্ত্বের পারিভাষিক শব্দ-সমূহের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়।

কারণ আমরা জানি, রসতত্ত্বে আগ্রহী পাঠক-সমাজ, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী বা ব্যভিচারী, আলম্বন কিংবা উদ্দীপন ইত্যাদি শব্দ শুনে নিশ্চয়ই খুব উদ্দীপিত হয়ে উঠবেন না। 'রস'-এর প্রতি যতো তীব্র আকর্ষণই থাকুক না কেন, এ শব্দসমূহ তাঁদের শ্রুতিকে যথেষ্ট মাত্রায় প্রীত করবে না। এক অসীম অস্বস্তি তাঁদের তাড়িত করবে সর্বক্ষণ। এবং হয়তো অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা শব্দগুলোর

আভিধানিক অর্থ ধ'রে নিয়ে বক্তব্য অনুধাবনে বিভ্রান্ত হবেন অনিবার্য-ভাবে। ফলে তাঁদের রসতত্ত্ব জিজ্ঞাসার বিঘ্ন-বিনাশের প্রত্যাশায় আমরা প্রথমেই এ-সমস্ত পারিভাষিক শব্দের বিষয় অনুসারী সংজ্ঞার্থ প্রদানে প্রয়াস পাবো।

ভাব, অনুভাব, সঞ্চারী, আলম্বন, উদ্দীপন ইত্যাদি শব্দগুলোর কোনোটিই প্রচলিত আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত নয়, কাব্যতাত্ত্বিকেরা এগুলোকে ব্যবহার করেছেন প্রাচ্য-রসতত্ত্বের বিশেষ শব্দ (term) হিসেবে।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষের মনে অজস্র ভাব বা ইমোশন বর্তমান। আর এ ভাব (চিত্তবৃত্তি) বা ইমোশনই হ'চ্ছে রসের মৌলিক উপাদান। কাব্যতাত্ত্বিকদের ভাষায়, কাব্যানুভবের ফলে মনের এ 'ভাব'ই অনুকূল আবহে রসে রূপান্তরিত হয়। পণ্ডিতদের বিচারে 'ভাব' লৌকিক কিন্তু তার থেকে রূপান্তরিত 'রস' অলৌকিক।

ক্রোধ, ভয়, শোক, ভালোবাসা (রতি) প্রভৃতি মানব-মনের ভাব সংখ্যাতীত হ'লেও, আলোচনার সুবিধার জন্যে ভারতীয় কাব্য-তাত্ত্বিকেরা এদের মধ্যে প্রধান ও অপ্রধান ভেদে সর্বসাকুল্যে এগুলোর সংখ্যা নির্দেশ ক'রেছেন বিয়াল্লিশ। এর-মধ্যে তাঁদের বিবেচনায় প্রধান বা স্থায়ী ভাবের সংখ্যা-নয়টি (আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সংখ্যা নির্দেশিত হয়েছে আটটি, পরবর্তীকালে 'শম' ভাবকে সংযুক্ত করে—একে নয় (৯) করা হ'য়েছে)। এবং অপ্রধান যাকে ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব বলা হয় তার সংখ্যা নির্দেশিত হ'য়েছে তেত্রিশটি। স্থায়ী এবং ব্যভিচারী বা সঞ্চারী বিশেষণেই উক্ত ভাবের স্বভাব-ধর্ম অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। মানুষের মনের এ ভাব বা চিত্তবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। কোনো কোনো ভাবের আন্দোলনে মানুষ গভীর-ভাবে হয় আলোড়িত, বেগবান প্রবাহে হয় সমর্পিত। তার শক্তিতে

স্থায়িত্বে হয় বশীভূত—মানুষের মনের সে-সব দীর্ঘস্থায়ী প্রবল চিত্তবৃত্তিকে প্রাচ্য-পণ্ডিতেরা চিহ্নিত করেছেন. স্থায়ী-ভাব-রূপে। আচার্য অভিনব গুপ্তের ভাষায়: "বহুনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স অস্থায়ী ভাব।" (ধ্বন্যালোক, টীকা, ৩/২৫) অর্থাৎ ভাবরূপ বহু চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে ভাব বহুলরূপে অনুভূত হয় তা-ই স্থায়ীভাব। যেমন মহর্ষি বাল্মিকীর হৃদয় একদা তমসাতীরে ক্রৌঞ্চনিধনে স্থায়ীভাব 'শোক' দ্বারা আন্দোলিত হয়ে প্রথম করুণ রসের শ্লোকের জন্ম দিয়েছিলেন।

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকে শকুন্তলার রূপলাবণ্যে রাজা দুষ্যন্ত 'রতি'ভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে এ-স্থায়ী ভাব-সমূহ কখনোই রস নয়। কারণ পণ্ডিতদের বিচারে ভাব লৌকিক এবং ব্যক্তিক কিন্তু এ ভাব থেকে যখন রসের জন্ম অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, তখন তা ব্যক্তি হৃদয়ের আনুভূতিক বাতাবরণ অতিক্রম ক'রে খণ্ড-কালের সীমা পশ্চাতে ফেলে হ'য়ে ওঠে সার্বিক আস্বাদনে সর্বজনীন এবং সর্বকালিক।

জাগতিক ভাবের দেহে কবি তাঁর নির্মাণ শক্তির সহায়তায় রসের প্রাণ-সঞ্চার করেন। জীর্ণ-ভাব মুহূর্তে সমস্ত জড়ত্ব পরিত্যাগ ক'রে ভূমানন্দে ভাস্বর-রসে রূপান্তরিত হয়। আর তখন "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"—এ পরিণত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের বাস্তব জীবনের কোনো তীব্রতম শোকানুভূতি কখনোই মধুর সাঙ্গীতিক দ্যোতনা আনতে সক্ষম নয় কিন্তু কবি যখন ছন্দোবদ্ধ শব্দরূপে সেই চিত্তদীর্ণ তীব্র-বেদনার সমাচার তাঁর কাব্যে বাণীরূপ দেন তখন সেটা অবশ্যই "sweetest songs" এ পরিণত হয়। আর এ-জন্যই করুণ-রসের

মানসিক উপাদান 'শোক' ভাব দুঃখময় বিবেচিত হলেও পরিণামী রস কিন্তু কাব্যতাত্ত্বিকদের ভাষ্যে নিত্য-আনন্দের হেতু।

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকেরা এ-রসের স্বরূপ বিশ্লেষণে যে-প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। আচার্য অভিনব গুপ্ত আদি কবির দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্। এবং হি সতি তদ্দুঃখেন সোঽপি দুঃখিত ইতি কৃত্বা রসস্যাত্মতেতি নিরবকাশং ভবেৎ। ন তু দুঃখসংতপ্তস্যৈষা দশেতি।"

—এর মর্মার্থ হচ্ছে,- এ-কথা স্বীকার্য, এ-শোক মুনির (বাল্মিকীর) নিজের শোক নয়। তা যদি হ'তো, তবে ক্রৌঞ্চের শোকে মনি দুঃখে মুহ্যমানই থাকতেন, তাঁর দ্বারা করুণ-রসের শ্লোক রচনা সম্ভব হ'তো না। কারণ, কেবল দুঃখসন্তপ্ত ব্যক্তির কাব্য রচনা কোথাও দেখা যায় না।

এবং এ বিষয়ের মর্ম-রহস্য উদঘাটনে তিনি (অভিনব গুপ্ত) যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যি অভিনব। তাঁর বর্ণনায়, ক্রৌঞ্চের বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর ক্রৌঞ্চীর শোক মুনির মনে, এ শোক লৌকিক শোক থেকে স্বভাবে স্বতন্ত্র, নিজের ভাবের আস্বাদনস্বরূপ (শোকভাব) করুণ-রসে পরিণত। এবং এ যেন ভরা কলসী থেকে জল যেমন উপচে পড়ে, তেমনি করে ওই রস বাল্মিকী মুনির মন থেকে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকরূপে নির্গত হ'য়েছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যযোগ্য, আদি-কবি বাল্মিকীর উচ্চারিত এ শ্লোকে কোথাও আত্ম-বেদনার সমাচার নেই কিংবা শব্দরূপ লাভ করে নি বিশেষ ক্রৌঞ্চীর বেদনার বিলাপ। বিশেষ কবি ও বিশেষ বেদনার্ত পাখীর শোক এখানে মুহূর্তে রূপায়িত হয়েছে সর্বকালের তাবৎ কাব্য-পাঠকের ঘনীভূত শোকানুভূতিতে। আমরা যতোবার ওই শোকের শব্দরূপ পাঠ করি, ততোবারই বেদনায় আক্রান্ত হই,

তবুও বারংবার বাল্মিকীর কাছেই যাই। শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডী দেখে মানব-চিত্ত অপার বেদনায় বিমোহিত হয়, তবু তাঁর 'ম্যাকবেথ' কিংবা 'কিং লীয়র' নাটকে দর্শকের অনটন হয় না। ইতালীয়ান দার্শনিক বেনে ডেটো ক্রোচে লৌকিকভাবের কাব্যিক-রসে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছেন চমৎকারভাবে: "...For poetic idealization is not a frivolous embellishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation. He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself, whatever may be his efforts." (European Literature in the Nineteenth Century.) এবং এ-রসানুভূতি সর্বত্রই পণ্ডিতদের ভাষায় 'সন্তানবৃত্তি বিশিষ্ট' অর্থাৎ এর ধর্ম বিস্তারলাভ, সীমাহীন ব্যঞ্জনায় ব্যাপ্ত হওয়া। ধরা যাক কোনো পাঠক যদি মধুসূদন কিংবা রবীন্দ্রনাথের অথবা যে কোনো-ভাষার সার্থক কোনো কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য-কবিতার কেবল ব্যাকরণ ও শব্দার্থ অনুসন্ধান করেন তবে তাঁর সে-প্রচেষ্টায় ভাষা-জ্ঞানের পরিচয় মিললেও কাব্য-রস নিশ্চয়ই নাগালের বাইরে থেকে যাবে। লৌকিক ভাবকে বাদ দিয়ে কবিতা নির্মাণ সম্ভব নয় কিন্তু মানুষের সে-জাগতিক ভাবই (সুখ-দুঃখাদি) কবিতা নয়। কারণ বীজ থেকে যেমন বৃক্ষ জন্মালেও বৃক্ষ বীজ নয়; তেমনি ভাব পরিণামে রসে রূপান্তরিত হলেও রস কখনোই ভাব নয়।

ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকেরা জানতেন, কোনো অলঙ্কার-শাস্ত্রীর সাধ্য নেই যে-কোনো কাব্য-পাঠককে রসের স্বাদ পাইয়ে দেয়া। কারণ তাঁদের বিবেচনায় কাব্যরসের স্বাদ সর্বত্রই 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী'। এবং

রসের আশ্রয় কবি বা কবিতা নয়, সহৃদয় পাঠকের মন। আচার্য অভিনব গুপ্তের ভাষ্যে,—'সহৃদয়' হচ্ছেন কেবল তাঁরাইঃ "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ বিশদীভুতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবন-যোগ্যতা তেস হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।" (ধ্বন্যালোক, টীকা-১/১) —অর্থাৎ নিরন্তর কাব্যানুশীলনের ফলে যাদের মন দর্পণের মতো স্বচ্ছ, নির্মল, কেবল সে-সব সহৃদয়-চিত্তেই রসের প্রতীতি বা অভি-ব্যক্তি ঘটে থাকে। ফলে তাঁর মতে, রস অনুমান সাপেক্ষ কোনো ব্যাপার নয়, কারণ এটা একান্তভাবে প্রতীতি-নির্ভর বিষয়। এ প্রতীতিকে সম্ভব করে তোলে কবিতার 'ধ্বনি' এবং 'ব্যঞ্জনা'। অতএব কবিতার বাচ্যার্থ (শব্দার্থ) বা লক্ষণার্থ নয়, 'ব্যঞ্জনাগত অর্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থই রসানুভবের জনক। আর সে-ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থবোধের জন্যে বাচ্যার্থের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, কাব্যার্থের বোধ অপরিহার্য।

("শব্দার্থশাসন জ্ঞানমাত্রেনৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে স তু কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞেরেব কেবলম্।।"
—ধ্বন্যালোক, ১/৫)

তাহলে কাব্যার্থের বোধ-সম্পন্ন পাঠকই কেবল সহৃদয়পাঠক। সুতরাং 'রস'-'আস্বাদ' হলেও, যিনি রস সৃষ্টিতে আগ্রহী, তাঁকে যেমন সাধনা করতে হয়, আবার যিনি সে রসের প্রতীতি লাভ করতে আগ্রহী, তাঁকেও আস্বাদনের জন্যে নিত্য-অনুশীলনে চিত্তকে প্রস্তুত করতে হয়। কাব্যের জগতে কবি ও পাঠক দু'পক্ষই রসের সাধনায় ব্রতী। কবির কাম্য, অনুভূত-সত্যকে আকাঙ্ক্ষিত শব্দরূপে সহৃদয়-পাঠকের কাছে পৌঁছে দে'য়া, আর পাঠকের প্রচেষ্টা, কবির ধ্যানের জগতকে আত্ম-চেতনালোকে উপলব্ধি করা। ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্তের ভাষায়ঃ "—শব্দার্থজাত ভাব-তন্ময় চিত্তে আনন্দ স্বরূপের প্রকাশই রস।" (কাব্যালোক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩)।

কিন্তু এ রস-প্রতীতি সম্ভব হয় কোন সূত্রে? কারণ পাঠক বা দর্শক চিত্তের রতি-প্রভৃতিভাব তো একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা হলে তাঁদের চিত্তে রসের একই ধরনের অভিব্যক্তি সম্ভব কিভাবে?—এ-সমস্ত প্রশ্ন প্রসঙ্গে প্রাচ্য-কাব্যতাত্ত্বিকেরা মোটেই অসচেতন ছিলেন না। তাঁরা জানতেন মানুষ জাগতিক জীবনে স্বীয় স্বার্থ-চিন্তায় নিমগ্ন, অপরের সুখে কিংবা দুঃখে, আনন্দ অথবা বেদনায়, উৎসাহ কিংবা হতাশায় কেউ-ই সমভাগী হয় না। অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত প্রতিক্রিয়ারও প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আর এরপর আছে স্থান-কাল-সমাজ-ভাষা-সংস্কৃতির ব্যবধান-জনিত কারণ, যাতে কালে কালে দেশে দেশে মানুষের আন্তর-অভিঘাতের তারতম্য ঘটে থাকে। অথচ কাব্য-সাহিত্য পাঠে ও শ্রবণে কিংবা নাটকাদি দর্শনে পেশাগত শ্রেণীগত শত পার্থক্য সত্ত্বেও ভিন্নকালের, পৃথক ভূ-খণ্ডের আলাদা মানুষ (পাঠক, শ্রোতা কিংবা দর্শক) একটা সার্বভৌম সর্বজনীন অনুভবে আক্রান্ত হন। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের পরিভাষায় যার নাম **সাধারণীকরণ**। এবং তাঁদের বিবেচনায় এ 'সাধারণীকরণ'-এর ফলে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত তাবৎ দর্শক ('সামাজিকগণ') সাময়িকভাবে হলেও তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে একই 'আনন্দলোকের' অধিবাসীতে রূপান্তরিত হন। রঙ্গালয়ে প্রবেশের পূর্বে কেউ বা অধ্যাপক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, লেখক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, শিল্পী, আইনজীবী অথবা সরকারী অফিসের কর্মচারী; প্রত্যেকের পেশা পৃথক, বেশ আলাদা, জীবনের প্রতিবেশ ভিন্ন, জীবনযাত্রার মান স্বতন্ত্র, মন-মানসিকতা ও অভিন্ন হওয়ার সঙ্গত কোনো কারণ নেই, (যেহেতু জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষায়, আনন্দ-বেদনায়, সমস্যা সংগ্রামে, প্রাপ্তি প্রত্যাশায় এরা প্রত্যেকেই পৃথক)। অথচ বিচিত্র পেশার এ স্বতন্ত্র-স্বভাবের মানুষই যখন পৃথক বাসস্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন পথে আলাদা যান-বাহনে এসে হাজির হন

একই প্রেক্ষাগৃহে বিশেষ নাটকের অভিনয় দেখতে, তখন দেখা যায় নাটকের বিশেষ মুহূর্তে এদের প্রতিক্রিয়া একই ধরনের অর্থাৎ বেদনা-ময় কোনো দৃশ্যের অভিনয়ে যেমন প্রত্যেকের চোখ সজল হয়ে ওঠে, তেমনি নাটকের আনন্দঘন মুহূর্তে অনাবিল উৎসাহ বা উল্লাসের অংশীদার হন সবাই। অর্থাৎ কাব্য-নাট্যের সেই বিশেষ রসঘন মুহূর্তে কেউ-ই আর বিশেষ থাকেন না, এক নির্বিশেষ আবেগে একাত্ম হয়ে যান। এই যে পৃথক ব্যক্তিত্বের অ-সাধারণত্ব বিলোপকারী অবস্থা ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকেরা এটাকেই অভিহিত করেছেন 'সাধারণীকরণ' নামে। তাঁদের বিবেচনায়, অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অভিমান অপসারিত হয়ে চিত্তলোকে জাগ্রত হয় এক সাধারণ-সত্তা এবং এ-সর্বগ্রাসী সত্তার জাগরণে সহৃদয় পাঠক কিংবা সামাজিক সে মুহূর্তে বিস্মৃত হন পৃথক পরিচয়, তখন আর তাঁরা কারো পিতা, পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা, শত্রু কিংবা মিত্র নন, তাঁর বিশেষ রসের রসিক (কাব্য কিংবা নাট্যের), তাঁদের প্রধান পরিচয় বিশেষ রসের ভোক্তা হিসেবেই। প্রেক্ষাগৃহে সমবেত সকলের হৃদয় মন, চোখ কান যেন বিশেষ সুরের একই মাত্রায় বাধা। আচার্য অভিনব গুপ্তের ভাষ্যে : "সর্বসামাজিকানাম্ একঘনতা' অর্থাৎ সকল সামাজিকের (দর্শকের) একঘনতা বা "সকল-সহৃদয়সংবাদশালিতা"। আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ এটাকেই ব্যাখ্যা করেছেন আরো মনোহর উচ্চারণে :

> 'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
> তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।।"
>
> —সাহিত্যদর্পণ, ৩/৪৫

—কাব্যের চরিত্র ও ভাব (বিভাবাদি) আস্বাদনের মুহূর্তে (মনে হয়) ওটা অন্যের কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যের নয়, আমার নিজের, কিন্তু সম্পূর্ণ

নিজেরও নয়। এমনি ক'রেই (কাব্য-নাট্যের আস্বাদ বা রস) কোনো (ব্যক্তিত্বের) পরিচ্ছেদে আবদ্ধ থাকে না।

ফলে, ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকদের বিচারে সবদেশের সবকালের শ্রেষ্ঠ নাট্য কিংবা কাব্য, দর্শক অথবা পাঠক-শ্রোতাকে (সহৃদয় সামা-জিকগণকে) রসাস্বাদনে এ ব্যাপকতর বিশাল সাধারণ-সত্তার সাক্ষাৎ-কার ঘটিয়ে থাকে। এবং নাট্য বা কাব্যের চরিত্র ও ভাবের সঙ্গে এ নিত্য সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রক্রিয়াই প্রাচ্যকাব্যতত্ত্বে 'সাধারণী-করণ' নামে খ্যাত।

ভাব: 'ভাব' শব্দটি বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত। সংস্কৃত 'ভূ'-ধাতু কিংবা তার প্রেরণার্থক ক্রিয়া 'ভাবি'-ধাতু থেকে শব্দটি উৎপন্ন হ'য়েছে বলে পণ্ডিতদের অনুমান। যেহেতু ধাতুটির মূল অর্থ, 'হওয়া'-সেজন্যে এর থেকে নানা অর্থ পরবর্তীকালে সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষায় সংযোজি হয়েছে। অমরসিংহের সংস্কত অভিধান 'অমরকোষ'-এ এর অর্থ দেয়া হয়েছে সত্তা, স্বভাব, অভিপ্রায়, চেষ্টা, আত্মা, জন্ম, মানস, বিকার, বিদ্বান ইত্যাদি। এ ব্যতিরেকে ভাব শব্দে,—বিভূতি, পদার্থ, সৃষ্টি, অবস্থা, ক্রিয়া, মর্ম, তাৎপর্য, স্থিতি, সম্ভাবনা, আবেশ, চিত্ত, জীব, প্রকার, কাম,অনুরাগ, প্রণয়, সৌহার্দ, ভক্তি, অনুভূতি, অঙ্গভঙ্গী, বিলাস, চিন্তা ইত্যাদি অর্থও বুঝিয়ে থাকে।

তবে কাব্যতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে এটিকে একটি পারিভাষিক শব্দ হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন। ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্তের 'কাব্যা-লোক' গ্রন্থে 'ভাব' শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে:—"অলঙ্কারশাস্ত্রে শব্দটি তিনটি অর্থে প্রচলিত; যথা,—

(১) রতি, শোক প্রভৃতি ভাব, যাহাদের স্থায়ী ও ব্যভিচারী-রূপে দুই ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে;

(২) দেবাদিবিষয়া রতি, প্রধান-ভূত সঞ্চারীএবং উদ্বুদ্ধমাত্র স্থায়ী;

(৩) নির্বিকার চিত্তে প্রণয়জনিত প্রথম বিক্রিয়া, নারীগণের হাবের পূর্বাবস্থা।"

(কাব্যালোক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২১)

বলাবাহুল্য,—এর প্রথম অর্থেই 'ভাব' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার। এবং এ অর্থ ধরেই ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁর History of Sanskrit poetics' গ্রন্থে ভাব শব্দটির ইংরেজী অনুবাদে ব্যবহার করেছেন—'emotion' শব্দটিকে। 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র গ্রন্থকার অতুলচন্দ্র গুপ্ত অধিকতর নৈপুণ্যের সঙ্গে 'ভাব'কে 'ইমোশন শব্দ দিয়েই বর্ণনা করেছেন এ-ভাবে:

"ইমোশন শুদ্ধ feeling বা সুখদুঃখানুভূতি নয়। আধুনিক মনোবিদ্যাবিদ্‌দের ভাষায় ইমোশন হচ্ছে একটি complete psychosis, সর্বাবয়ব মানসিক অবস্থা। অর্থাৎ ইমোশন বা ভাবের সুখদুঃখানুভূতি কতকগুলো idea বা বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে বিদ্যমান থাকে। (—কাব্যজিজ্ঞাসা, পৃঃ ২৭-২৮) ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্য-বিচার' গ্রন্থে আচার্য অভিনব গুপ্তের অনুসরণে 'ভাব' শব্দটিকে আরো গভীরতর অর্থে প্রয়োগ-প্রয়াসী: "এই ভাবকে একদিকে যেমন emotion বলা যায়,, অপরদিকে তেমনি সংবিদ বা জ্ঞানও বলা যায়। কারণ, জ্ঞান স্বরূপেই ইহার আবির্ভাব এবং জ্ঞানরূপেই ইহার লয়। জ্ঞান-মাত্রের মধ্যেই ভাব বা emotion আছে, এবং emotion মাত্রের মধ্যেই জ্ঞান আছে।" (কাব্যবিচার, পৃঃ ১২৯)

তবে আমাদের বিবেচনায় ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের 'ভাব' কেবল লৌকিক emotion নয়,—এটা রসের মতোই লোকাতীত বিষয়। কারণ আচার্য ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে,—'ভাব' বাক্য দ্বারা আনীত, বিভাব দ্বারা আহৃত, অনুভাবের সাহায্যে জ্ঞানগোচর এবং অভিনয়ের মাধ্যমে প্রতিভাত হয়। এবং

বাক্য, অঙ্গ ও সত্তার একাগ্রতা দিয়ে সংযুক্ত কাব্যার্থকে ভাবিত করে ব'লেই ভাব।---তিনি এ-ক্ষেত্রে কোথাও জাগতিক জীবনের কার্যকারণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন নি। আচার্য অভিনব গুপ্তও ভরত-কথিত এ বক্তব্যকেই আরো স্পষ্টতর করে তুলেছেন তাঁর অভিনব-ভাষ্যের আশ্রয়ে: "ভাব শব্দের তাবৎ চিত্তবৃত্তি বিশেষা এব বিবক্ষিতা:" ---অর্থাৎ ভাব শব্দে বোঝায় (সহৃদয় পাঠক বা সামাজিকের) চিত্তবৃত্তিবিশেষকে। তবে তাঁর ব্যবহৃত 'চিত্তবৃত্তি'---এমন চিত্তবৃত্তি যা নিজে আস্বাদন করে কিংবা বিভাবাদিকে আস্বাদযোগ্য করে তোলে। এবং এজন্যেই তিনি ঘোষণা করেন: "...যঃ অন্তর্গতঃ অনাদিপ্রাক্তন-সংস্কার- প্রতিভান-ময়ো. ন তু লৌকিকবিষয়জ:...."
— অর্থাৎ যা কবির অন্তর্গত অনাদিকাল হ'তে আগত প্রাক্তন-সংস্কারের প্রকাশ-স্বরূপ, তা কখনোও লৌকিক বিষয় থেকে সৃষ্ট নয়।

সুতরাং ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে 'ভাব' হচ্ছে, সহৃদয় সামাজিকের চিত্তবৃত্তিবিশেষ, যা লোকাতীত বিভাদির সাহায্যে বাসনালোক হতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে বিভাবাদিকে আস্বাদনযোগ্য করে এবং এর ধর্ম হচ্ছে হৃদয়ের বিগলন'।

এ 'ভাব'কে চারিত্র্য-লক্ষণ অনুসারে পণ্ডিতেরা দু'ভাগে বিভাজিত করেছেন, (১) স্থায়ী ভাব এবং (২) ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব।

ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকেরা জানতেন, মানুষের হৃদয়ের বিচিত্র ভাবরাজি তার চিত্তকে আন্দোলিত করে নিরন্তর, এদের সনাক্ত করা কিংবা সংখ্যা নির্ণয় করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তবু আলোচনার সুবিধার্থে তাঁরা ভাবের স্বভাব-ধর্ম বিচার ক'রে স্থায়ীভাবের সংখ্যা নির্দেশ করেছেন নয়টি (ভরতের নাট্যশাস্ত্রে স্থায়ীভাবের সংখ্যা উল্লেখিত আট, পরে অভিনব গুপ্ত 'শম' ভাবকে সংযুক্ত করে নয়টিতে পরিণত করেন), এবং অস্থায়ী অর্থাৎ ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের সংখ্যা

ধরেছেন তেত্রিশটি অর্থাৎ তাঁদের বিচারে ভাবের সর্বমোট সংখ্যা বিয়াল্লিশ (৯+৩৩=৪২)।

প্রাচীন আচার্যগণ,— যেমন রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম—মানবচিত্তের এ নয়টি স্থায়ীভাবের উল্লেখ করেছেন, তেমনি তাঁদের কাব্যতত্ত্বের তালিকায় তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের নামও উক্ত হয়েছে উজ্জ্বলভাবে: নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা উগ্রতা, মোহ, বিরোধ বা জাগরণ, স্বপ্ন বা সুপ্তি, অপস্মার বা মূর্ছা, গর্ব, মরণ বা প্রাণ-ত্যাগের অনুরূপ অবস্থা, আলস্য, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা বা ভাবগুপ্তি, উৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মৃতি, ধৃতি, মতি, ব্যাধি, ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক।

সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাষায় স্থায়ীভাব হচ্ছে:

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুনক্ষমা:।
আস্বাদাঙ্কুর-কন্দোহসৌ ভাব: স্থায়ীতি সম্মত:॥

—সাহিত্যদর্পণ

—অর্থাৎ অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ ভাবসমূহ যাকে বিলুপ্ত করতে পারে না, যা আস্বাদ স্বরূপ অঙ্কুরের কন্দ বা বীজরূপ, তাই স্থায়ীভাব বলে জ্ঞাত বা স্বীকৃত হয়। স্থায়ীভাবের বর্ণনায় ভোজরাজের উক্তি আরো চমৎকার:

"চিরং বিত্তেহবতিষ্ঠন্তে সংবধ্যন্তে হনুবন্ধিভি:।
রসত্বং প্রতিপাদ্যন্তে প্রবুদ্ধা স্থায়িনোহত্র তে।"

- সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫/১৯

—সেই স্থায়ী ভাবসমূহ বাসনালোক থেকে প্রবুদ্ধ হ'য়ে দীর্ঘকাল চিত্তে অবস্থান করে, অনুগত ব্যভিচারী ভাবসমূহের সাহায্যে সম্বদ্ধ হয় এবং রসত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

আর এ স্থায়ীভাবের গতিকে সঞ্চারিত করে ব'লেই ব্যভিচারী ভাবকে সঞ্চারীভাব নামেও চিহ্নিত করা হয়। ভরত অবশ্য তাঁর নাট্যশাস্ত্রে কোথাও সঞ্চারী নামটি প্রয়োগ করেন নি। তিনি সর্বত্র এটিকে ব্যভিচারী ভাব রূপে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ তাঁর মতে: "বি অভি ইত্যেতৌ উপসর্গৌ, চর ইতি গত্যর্থৌ ধাতুঃ বিবিধম্ আভিমুখ্যেন রসেষু চরন্তি ইতি ব্যভিচারিণঃ।—নাট্যশাস্ত্র, ৭/৪৩

— অর্থাৎ বি ও অভি এ দুটো উপসর্গ চর এ গত্যর্থক ধাতু, রসসমূহের অভিমুখে বিচিত্র উপায়ে (নানাভাবে) বিচরণ করে ব'লে ব্যভিচারী।

ব্যভিচারী ভাবের সঙ্গে স্থায়ীভাবের সম্পর্ক বিশ্লেষণে আচার্য অভিনব গুপ্তের বক্তব্য হচ্ছে,—ব্যভিচারীভাবগুলো বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো তড়িৎগতিতে প্রবাহিত হয়ে স্থায়ীভাবের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয় এবং তাদের (স্থায়ী ভাবের) বৈচিত্র্য প্রকাশ করে। বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাষ্য: "স্থায়িন্যুন্মগ্ননিমগ্নাঃ" অর্থাৎ (ব্যভিচারী ভাব) স্থায়ীভাবে একবার ডুবছে আবার ভাসছে। তবে এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকেরা মনে করতেন,—স্থায়ীভাব কখনও কখনও ব্যভিচারীভাবে পরিণত হলেও ব্যভিচারীভাব কখনও স্থায়ীভাবে পর্যবসিত হতে পারে না। অর্থাৎ স্থায়ীভাবের ব্যভিচারিতা হতে পারে কিন্তু ব্যভিচারী ভাবের স্থায়িতা হয় না।

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকদের বিবেচনায় কাব্যনির্মাণ-কলায় তিনটি পর্যায় গুরুত্বপূর্ণ: (১) বিভাব, (২) অনুভাব এবং (৩) সঞ্চারী।

বিভাব: আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বিভাবের অর্থ প্রদান করেছেন: "বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতুরীতি পর্যায়াঃ।" নাট্যশাস্ত্র, ৭/৫

—অর্থাৎ বিভাব, কারণ, নিমিত্ত, হেতু (মূলত) একই পর্যায়ের (শব্দ)। আসলে বিভাব হচ্ছে, আমাদের জীবনে যা রতি ইত্যাদি ভাবের হেতু বা উদ্বোধক, তা-ই কাব্যে কিংবা নাটকে শিল্পিত প্রকাশে

বিভাব নামে আখ্যায়িত হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাষ্যে : "রত্যা-দুদ্বোধকা লোকে বিভাবা : কাব্যনাট্যয়ো :।" (—সাহিত্যদর্পণ, ৩/৬৪) অর্থাৎ লোকে যা রতি প্রভৃতি ভাবের হেতু বা উদ্বোধক, কাব্যে ও নাট্যে তা-ই বিভাব নামে পরিচিত।

অর্থাৎ আমাদের জাগতিক জীবনে যে-সমস্ত কারণ আমাদের চিত্তস্থিত বিভিন্ন ভাবকে উদ্বোধিত করে, তাকেই কাব্যতত্ত্বের পরিভাষায় 'বিভাব' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ বিভাবকে আবার আন্তর-লক্ষণের পার্থক্যহেতু দু'ভাগে বিভাজিত করা হ'য়ে থাকে : (১) আলম্বন বিভাব ও (২) উদ্দীপন বিভাব।

আলম্বনবিভাব : যে বস্তু অর্থাৎ যাকে অবলম্বন করে রসের উৎপত্তি, তাকে বলা হয় আলম্বন বিভাব। যেমন, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকে নায়িকা শকুন্তলাকে দেখে রাজা দুষ্যন্তের চিত্তে রতিভাবের জাগরণ অনিবার্য হয়ে উঠলো, এখানে শকুন্তলা আলম্বন বিভাব। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে নায়িকা শকুন্তলা রতিভাবের (নৃপতিচিত্তে) উদ্বোধক কারণ বা হেতু সেজন্যেই আলম্বন বিভাব।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টি থেকে অজস্র উজ্জ্বল আলম্বন বিভাবের উদাহরণ সঙ্কলিত করা মোটেই আয়াস-সাধ্য ব্যাপার নয়, আমরা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টিকে আরেকটু স্পষ্ট করতে চাই :

. . . . কতদিন
যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছে যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি,
অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া—
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার।

—(বিদায় অভিশাপ)

—এখানের কচের হৃদয়ে রতিভাবের উদ্বোধক-হেতু নায়িকা দেবযানী। ফলে, দেবযানী আলম্বন বিভাব।

উদ্দীপন বিভাব ঃ যে-সকল অবস্থা অথবা যে বিশিষ্ট পরিবেশটি বিভিন্ন ভাবের উদ্রেকে সহায়ক হ'য়ে রস-সৃষ্টির আনুকূল্য করে থাকে, তাকে 'উদ্দীপনবিভাব' বলা হয়। ইংরেজীতে এগুলোকে বলা যেতে পারে **'odjective conditions'**। যেমন ধরা যাক, পূর্বোক্ত 'বিদায় অভিশাপ' কাব্য-নাট্যটি। এখানে রবীন্দ্রনাথ দেবযানীর হৃদয়ে প্রেমানুভূতির বা রতিভাবের উন্মেষ লগ্নটিকে চিত্রিত করেছেন উজ্জ্বল উদ্দীপন বিভাবের আশ্রয়ে :

দেবযানী। আছে মনে—
যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণ প্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তি-ঢালা,
চন্দনে চর্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা,
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া—"

— এখানে ফুলের বাগানে 'কচ'-এর প্রথম উপস্থিতিই দেবযানী-চিত্তে রতিভাবের উদ্রেকে যেমন অনুকূল আবহ সৃষ্টি করেছে, তেমনি পট্টবাস পরিহিত, তরুণ অরুণসম গৌরবর্ণ তনু, চন্দনে চর্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য ইত্যাদি নায়কের রূপলাবণ্য, প্রসাধন-ভূষণ ও নায়িকা-চিত্তে প্রেমানুভূতি জাগরণের সহায়ক উপাদান; ফলে অনুকূল স্থান-কাল যেমন কাব্যতাত্ত্বিককের বিচারে উদ্দীপন বিভাব হিসেবে চিহ্নিত, তেমনি নায়ক-নায়িকার সাজসজ্জা অর্থাৎ অঙ্গাদির অলঙ্কার-ভূষণ ও এ-বিভাবেরই অন্তর্গত। ব্যাপক অর্থে লৌকিক জীবনে বিশেষ ভাবের

উদ্দীপনে বা জাগরণে সহায়তা করে যে বস্তু বা বিষয়, তাকেই ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের পরিভাষায় বলা হয় **উদ্দীপন বিভাব।**

অনুভাবঃ অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ বা পরে আসে যে-ভাব। তা-ই অনুভাব পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের ভাষায়ঃ "যানি চ কার্যতয়া, তানি অনুভাব-শব্দেন। অনু পশ্চাদ্ ভাবঃ উৎপত্তির্যেষাম্। অনুভাবয়তি ইতি বা ব্যুৎপত্তেঃ।"

(—রসগঙ্গাধর, ১/১৬)

—এর মর্মার্থ হচ্ছে,—যা (আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবরূপ কারণের) কার্য বলে আখ্যায়িত তা-কেই (কাব্য ও নাট্যে) অনুভাব শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। অনু অর্থ (কারণসমূহের) পশ্চাৎভাব অর্থাৎ পরে উৎপত্তি যাদের তারা অনুভাব। যা (বিভাবসমূহের অন্তর্গত) ভাবকে অনুভব করায়, তাই অনুভাব।

আসলে আবেগ-মাত্রেরই দু'টো দিক বর্তমান,—একটি মানসিক বা আন্তরিক অন্যটি বাহ্যিক বা শারীরিক। আন্তর-পরিবর্তন সর্বদাই আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই ঘটে থাকে, কিন্তু শারীরিক পরিবর্তন অবশ্যই দৃষ্টিগ্রাহ্য। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে এ-ধরনের আন্তর-প্রক্রিয়ার বাহ্য (শারীরিক) লক্ষণসমূহের পারিভাষিক নাম দেয়া হয়েছে 'অনুভাব'। ধরা যাক যদি নায়ক কিংবা নায়িকা হৃদয়ে 'রতি' ভাবের জাগরণ ঘটলে,—তার অনুভাব রূপে আসে সাধারণত কটাক্ষ, ভ্রূ-বিলাস, কম্পন, রোমাঞ্চ ইত্যাদি শারীরিক লক্ষণসমূহ। আবার সেভাব যদি হয় 'শোক' তবে অনুভাব রূপে অনিবার্যভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে দীর্ঘশ্বাস, ক্রন্দন, হাহাকার, অশ্রু, মূর্চ্ছা ইত্যাদি।

অঙ্গী ও সঞ্চারী রসঃ রস প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকদের বিতর্কের অন্ত নেই। এ বিতর্ক যেমনি গভীর, সূক্ষ্ম, তেমনি ব্যাপক এবং জটিল। আমরা এ অধ্যায়ের অন্তিমে তাঁদের নৈয়ায়িক বোধে

দীপ্র তাত্ত্বিক আলোচনা বিশ্লেষণে না গিয়ে খুব সহজভাবে তাঁদের আলোচনার সারাৎসার সঙ্কলনে প্রয়াসী হবো।

তাঁদের রস-বিচারে তাঁরা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন যে, সাধারণত একাধিক রসের সার্থক সন্নিপাতে কবি-সৃষ্টি হয়ে ওঠে সুন্দর এবং সার্থকতর। তবে এ-বিচিত্র রসের আনন্দ-অভিসারে সর্বাধিক দীপ্রতা পায় বিশেষ একটি রস। তাকে আলঙ্কারিক পরিভাষায় তাঁরা অভিহিত করেছেন, অঙ্গী, প্রধান, মুখ্য, স্থায়ী বা আধিকারিক রসরূপে ঃ

"প্রসিদ্ধেহপি প্রবন্ধনাং নানারসনিবন্ধনে।
একো রসোহঙ্গীকর্তব্য স্তেষাম্ উৎকর্ষম্ ইচ্ছতা।।"

(—ধ্বন্যালোক, ৩/২১)

—অর্থাৎ (নাট্য বা কাব্যরূপ) প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ (রচনা) সমূহে নানা (বিচিত্র) রস সমন্বিত হ'লে তাদের উৎকর্ষের জন্যে একটি মাত্র রসকে অঙ্গীরস করা উচিত।

এখানে কোনো একটি রস 'মুখ্য' বা 'অঙ্গী' হলে অন্য রস হয়ে যায় অঙ্গস্থানীয় বা সঞ্চারী রস। যেমন, মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রস বিচারে পণ্ডিতদের মত হচ্ছে,—এ-কাব্যের প্রধান বা অঙ্গীরস হচ্ছে 'করুণ রস' এবং অঙ্গভূত বা সঞ্চারী রস হচ্ছে 'বীর' ও 'শৃঙ্গার রস'। কারণ বীরবাহুর মৃত্যুর শোকাবহ সংবাদে যে কাব্যের সূচনা, পিতা রাবণের প্রবল দুঃখানুভবে যার বিস্তার এবং বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদার মর্মন্তুদ বিলাপে যার প্রবল প্রসার (শোকের ঝড় বহিল সভাতে) সেখানে কবি উচ্চারিত 'বীর রসের' প্রতিশ্রুতি অকারণ হয়ে যায়। এবং কাব্যের অন্তিমে "সপ্ত দিবা-নিশি লঙ্কা কাঁদিলা নীরবে।" অর্থাৎ কাব্যের সূচনা থেকে অন্তিম পর্যন্ত করুণরসের প্রবল প্রাধান্য, সে তুলনায় কাব্যমধ্যে বীর কিংবা শৃঙ্গার রস নিতান্তই

স্বল্পায়ু এবং নিষ্প্রভ। ফলে এ-কাব্যের অঙ্গীরস 'করুণ' এবং বীর ও শৃঙ্গার রস ওই অঙ্গীরসকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। পরিশেষে আমরা আচার্য অভিনব গুপ্তের অবিস্মরণীয় উচ্চারণ উদ্ধৃত করছি:

বাহূনাং সমচেতানাং রূপং যস্য ভবেদবহু।
স মন্তব্যো রস: স্থায়ী, শেষা: সঞ্চারিণো মতা।।

(ধ্বন্যালোক, টীকা)

—অর্থাৎ সমবেত বহুরসের মধ্যে যার রূপ বহুলভাবে (গভীর বা স্থায়ীভাবে) উপলব্ধ হয়, তাকে স্থায়ীরস বিবেচনা করবে, আর বাকিগুলো (অবশিষ্ট) সব সঞ্চারী বা ব্যভিচারী রস।

গ্রন্থপঞ্জী

কাব্যজিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত

অলঙ্কার-চন্দ্রিকা—শ্যামাপদ চক্রবর্তী

কাব্যালোক—ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

সাহিত্য-বিবেক—ডক্টর বিমল মুখোপাধ্যায়

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য শিল্পের আঙ্গিক—আনন্দমোহন বসু

বাণীমন্দির—শশাঙ্কমোহন সেন

সাহিত্যের স্বরূপ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত

সাহিত্যের কথা—গুরুদাস ভট্টাচার্য

ধ্বন্যালোক (লোচন টীকা-সমেত:)—অধ্যাপক বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)

রসসমীক্ষা—রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রস ও কাব্য—ডক্টর হরিহর মিশ্র

সাহিত্য-দীপিকা—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

কাব্য-বিচার—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

Comparative studies in Pali & Sanskrit Alankaras—Dr. Heramba Nath Chatterjee

History of Sanskrit Poetics—Dr. S. K. De

অলঙ্কার-অন্বেষা—নরেন বিশ্বাস

কাব্য-তত্ত্ব অন্বেষা—নরেন বিশ্বাস

. . . . এ গ্রন্থমালার বই সবার জন্যে। . . . .

কবিতা কি এ নিয়ে নানা দেশে যুগ-যুগ ধরে আলোচনা হয়েছে, কবিতা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ উপমহাদেশে কবিতার যে-তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, তা য়ূরোপীয় চিন্তা থেকে ভিন্ন। এ তত্ত্বই এ বইয়ে বিবেচনা করা হয়েছে।